শুদ্ধাচার বিকাশে আত্মনিয়োগ করি,
দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ি।

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা কমিটি

প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য
আহ্বায়ক
পরিচালক (জনসংযোগ)

মো: ফজলুল হক	**মঈনুল হাসান রওশনী**
সদস্য	সদস্য
উপপরিচালক	সহকারী পরিচালক

যোগাযোগ

মো. জহির রায়হান
মহাপরিচালক (প্রশাসন), দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ
১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
টেলি: +৮৮ ০২-৯৩৪ ৯০১৩, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২-৪৮৩১ ৩৮৮৪,
ইমেইল: dg.admin@acc.org.bd ওয়েব: www.acc.org.bd

প্রকাশক

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

ডিজাইন

বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

দুর্নীতি দমন কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

দুর্নীতি দমন কমিশনের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯' দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর-২৯ (১) ধারা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে উপস্থাপন করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন

ইকবাল মাহমুদ, পিএইচডি
চেয়ারম্যান

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
কমিশনার

এ এফ এম আমিনুল ইসলাম
কমিশনার

বিষয়সূচি

হস্তান্তরপত্র ০৭

চেয়ারম্যানের বক্তব্য ০৮-১০

১ম অধ্যায় : দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম ১১-৩৪

১.১ ভূমিকা

১.২ অনুসন্ধান

১.৩ তদন্ত

১.৪ প্রাতিষ্ঠানিক টিম

১.৫ প্রসিকিউশন

১.৬ গ্রেফতার সংক্রান্ত

২য় অধ্যায় : দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক অভিযান ৩৫-৩৮

২.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান

৩য় অধ্যায় : দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ ৩৯-৪৮

৩.১ ভূমিকা

৩.২ দুর্নীতি বিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি

৪র্থ অধ্যায় : গণশুনানি ৪৯-৫৪

৪.১ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিকাশে গণশুনানি

৪.২ বাস্তবায়িত গণশুনানির পরিসংখ্যান

৫ম অধ্যায় : তথ্য ব্যবস্থাপনা ৫৫-৫৮

৫.১ কমিশনের তথ্য ব্যবস্থাপনা

৬ষ্ঠ অধ্যায় : ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা ৫৯-৬৪

৬.১ কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

৭ম অধ্যায় : প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ৬৫-৭৬

৭.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৭.২ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

৭.৩ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

৮ম অধ্যায় : সুপারিশমালা ৭৭-১০৬

৮.১ ভূমিকা

৮.২ স্বাস্থ্য খাত

৮.৩ ওষুধ শিল্প

৮.৪ সড়কে যানবাহন ব্যবস্থাপনা

৮.৫ নকল, ভেজাল ও নিষিদ্ধ পণ্য সরবরাহ

৮.৬ নিষিদ্ধ পলিথিনের আগ্রাসন

৮.৭ নদী দখল

৮.৮ দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত ভূমি রেজিস্ট্রেশন সেবা

৮.৯ ইটভাটা স্থাপন সংক্রান্ত

৮.১০ দীর্ঘমেয়াদি নৈতিকতার বিকাশে বিএনসিসি কার্যক্রম

৮.১১ সরকারি পরিষেবায় মধ্যস্বত্বভোগী

৮.১২ ওয়াসা

৮.১৩ আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট সংক্রান্ত

৮.১৪ বাংলাদেশ রেলওয়ে

৮.১৫ স্থায়ী সিভিল সার্ভিস সংস্কার কমিশন গঠন

৮.১৬ বিবিধ সুপারিশমালা

৯ম অধ্যায় : উপসংহার ১০৭-১১০

আদ্যক্ষরা ও বিস্তৃতি

ACC	Anti-Corruption Commission
ADB	Asian Development Bank
BCSIR	Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research
BDT	Bangladeshi Taka
BNCC	Bangladesh National Cadet Corps
BSTI	Bangladesh Standards and Testing Institution
CIC	Central Intelligence Cell
CID	Criminal Investigation Department
CMH	Combined Military Hospital
CMSD	Central Medical Storage Depot
CPC	Corruption Prevention Committee
DMU	Diesel Electric Multiple Unit
GDP	Gross Domestic Product
GIZ	Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (German Development Co-operation)
ICRF	Investigative Committee of the Russian Federation
ICT	Information and Communication Technology
ILIS	Integrated Lawful Interception System
INTERPOL	International Police
LIS	Land Information System
LMD	Lower Manair Dam
LTU	Large Tax Payers Unit
MOU	Memorandum of Understanding
NBR	National Board of Revenue
NTMC	National Telecommunication Monitoring Center
PSC	Public Service Commission
ROR	Records of Rights
RTI	Right to Information
SAP	Strategic Action Plan
SDG	Sustainable Development Goals
TI	Transparency International
TIN	Tax Indetification Number
UNCAC	United Nations Convention Against Corrption
UNDP	United Nations Development Programme
VAT	Value Added Tax
WASA	Water Supply and Sewerage Authority

হস্তান্তরপত্র

০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

জনাব মোঃ আবদুল হামিদ
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৯(১) ধারা মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে সমাপ্তকৃত বছরের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন (দ্বিভাষিক) আপনার কাছে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। উল্লিখিত আইন অনুসারে প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের সদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৯ সালের জন্য প্রণীত এ প্রতিবেদনে কমিশনের কার্য-সম্পাদন, সম্পাদিত কাজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জবাবদিহিতা এবং সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্যসহ কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুস্পষ্টীকরণ এবং সহজবোধ্যতার লক্ষ্যে কতিপয় সাধারণ তথ্য, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে কোনো বিভ্রান্তিমূলক বা ভুল তথ্য সন্নিবেশিত হয়ে থাকলে এবং পরবর্তীকালে তা উদ্‌ঘাটিত হলে মহোদয়কে অবহিত করা হবে।

এ বছর মহামারী করোনার প্রকোপের কারণে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিলে বিলম্ব হয়েছে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের কারণে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা আশা করি আগামীতে নির্ধারিত সময়েই কমিশন এ প্রতিবেদন দাখিল করতে সক্ষম হবে।

আমরা মহোদয়কে আশ্বস্ত করছি যে, দেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার বিকাশে কমিশন সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

গভীর শ্রদ্ধান্তে

ইকবাল মাহমুদ, পিএইচডি
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

এ এফ এম আমিনুল ইসলাম
কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৯(১) ধারা অনুসারে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে ২০১৯ সালে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সন্নিবেশিত আছে।

আইন দ্বারা সৃষ্ট এই প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধকে বিকশিত করার কাজে আইনগতভাবেই দায়িত্ব পালন করছে। দুর্নীতি সভ্যতার প্রাচীনতম অপরাধের একটি। এ অপরাধ বৈশ্বিক। বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত প্রতিটি দেশেই এর উপস্থিতি রয়েছে। তবে মাত্রার তারতম্য রয়েছে। বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা রয়েছে-এ কথা অস্বীকার করা সমীচীন হবে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, সরকারি পরিষেবা সর্বোপরি মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণের সংক্ষিপ্ত কোনো পথ হয়তো নেই। তবে পরিত্রাণের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার (রোডম্যাপ) প্রয়োজন রয়েছে। কোনোভাবেই দুর্নীতির কাছে পরাজিত হওয়ার সুযোগ নেই। সমসাময়িক বাস্তবতার নিরিখে দুর্নীতি দমন কমিশন ২০১৬ সালেই দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পথনকশা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ কর্মপ্রয়াসের অংশ হিসেবে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শে কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৭-২০২১) একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ কর্মপরিকল্পনাকে ভিত্তি করে কমিশন বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশন ইতোমধ্যেই নিজস্ব গোয়েন্দা কার্যক্রম, কমিশনের মামলা সংশ্লিষ্ট সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন, প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে সাংবৎসরিক-ভিত্তিতে পরিচালনা, দুর্নীতি ঘটার আগেই প্রতিরোধমূলক অভিযান পরিচালনা, সর্বোচ্চ দ্রুততার সাথে দুর্নীতির ঘটনা অনুসন্ধান ও তদন্ত করা, প্রসিকিউটিং সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন, অপরাধীদের আইন আমলে আনতে গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা, পদ্ধতিগত কারণে যেসব দুর্নীতি সংঘটিত হয় তা নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক টিম গঠন করে বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সুপারিশ করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, কমিশনের নিজস্ব স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ, তৃণমূল পর্যায়ে হয়রানিমুক্তভাবে সরকারি পরিষেবা নিশ্চিতকল্পে গণশুনানি পরিচালনা করছে। এছাড়া কর্মকর্তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধিতে তাদের পদোন্নতি, রেশন ও অন্যান্য প্রণোদনার ব্যবস্থাসহ বহুমুখী কার্যক্রম এই কর্মকৌশলের আলোকেই বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২২ সাল থেকে ২০২৭ সাল মেয়াদের আরো একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টিও কমিশন সক্রিয় বিবেচনা করছে।

কমিশন সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী। এ ভূখণ্ডের মানুষের উন্নত নৈতিকতার অজস্র উদাহরণ রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের নৈতিকতার মানদণ্ড ছিল ঈর্ষণীয়। তাঁরা ছিলেন সততা ও নৈতিকতার অনুপম দৃষ্টান্ত। দুর্নীতির কারণে এদেশের মর্যাদাকে বিশ্ব দরবারে ম্লান করার সুযোগ কাউকে দেওয়া যায় না। দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় এ কথা স্পষ্ট বলা যায়, অভাবের কারণে নয় বরং লোভের কারণে এদেশে দুর্নীতি সংঘটিত হয়।

দুর্নীতিপরায়ণদের আগ্রাসী লোভ নিয়ন্ত্রণের জন্যই কমিশন তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দমনমূলক কৌশল প্রয়োগ করছে। এক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদটিও প্রণিধানযোগ্য। যাতে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না----"। এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমেই সাংবিধানিকভাবে দুর্নীতি দমনে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় তথা রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে। তাই দুর্নীতিপরায়ণদের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কমিশনের সাংবিধানিক এবং আইনি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে দুর্নীতিসংক্রান্ত অপরাধসংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, মামলা তদন্ত করে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই ২০১৬ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে দুর্নীতি দমন কমিশন এর মামলায় আসামিদের গ্রেফতারের মাত্রা বাড়িয়ে আইনের আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রম শুরু করা হয়। গণমাধ্যম এ কার্যক্রমকে দুর্নীতিবিরোধী গ্রেফতার অভিযান বলে অভিহিত করে। হাজারের বেশি আসামিকে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়। এমনও ঘটনা ঘটেছে একই অফিসের পরপর তিনজন অফিস প্রধানকে একই ধরনের অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুধু গ্রেফতার নয়, বিগত চার বছরে দুদকের মামলায় অভিযুক্তদের শাস্তি নিশ্চিতকরণে মামলার তদন্তের গুণগত মান বৃদ্ধি ও প্রসিকিউশন কার্যক্রমে ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়। এর ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের করা বিগত পাঁচ বছরের মামলায় বিচারিক আদালতের রায়সমূহ পর্যালোচনা করলে এমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। দেখা যায়, দুর্নীতি দমন

কমিশনের মামলায় ২০১৫ সালে সাজার হার ছিল ৩৭%, ২০১৬ সালে সাজার হার ৫৪%, ২০১৭ সালে সাজার হার ৬৮%, ২০১৮ সালে সাজার হার ৬৩% এবং ২০১৯ সালে সাজার হার ৬৩% । এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৭ সাল থেকে কমিশনের দায়ের করা মামলায় সাজার হার বর্ধিত মাত্রায় স্থিতিশীল রয়েছে। বিগত ২ বছর সাজার হার একই রয়েছে। এটা কমিশনের ইতিবাচক অর্জন। ২০১৫ সালে যেখানে মামলায় সাজার হার ছিল মাত্র ৩৭%, সেখানে ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ধারাবাহিক মামলার সাজার হার হচ্ছে ৬০ শতাংশের উপরে। কিন্তু কমিশন এতে সন্তুষ্ট নয়। কমিশন প্রত্যাশা করে মামলায় সাজার হার হবে শতভাগ। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন, তা হলো কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মানিলন্ডারিং মামলার বিচারিক আদালতে বিগত দুই বছরে (২০১৮ ও ২০১৯ সাল) যেসকল রায় হয়েছে তার শতভাগ মামলার সাজা নিশ্চিত হয়েছে। কমিশন নিজস্ব প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকেই মামলার তদন্ত ও প্রসিকিউশনে গুণগত পরিবর্তন আনার অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে মামলা-মোকদ্দমা, গ্রেফতার, শাস্তিসহ সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পরও জনআকাঙ্ক্ষা অনুসারে দুর্নীতির মাত্রা কমেছে তা স্পষ্টভাবে বলা সমীচীন হবে না।

কমিশন মনে করে, মুষ্টিমেয় দুর্নিবার এই লোভী মানুষগুলোকে দুর্নীতি থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে সামাজিক শক্তি। সামাজিকভাবে দুর্নীতিপরায়ণদের প্রতি মানুষের তীব্র ঘৃণা দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে। সন্তান যখন পিতাকে প্রশ্ন করে, 'বাবা, তুমি কি ঘুষ খাও? তুমি যদি ঘুষ খাও তাহলে আমি তোমার ভাত খাব না।' তখন দুর্নীতি দমন কমিশনকে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুভূত হয়।

একথা আমাদের সবাইকে বিশ্বাস করতেই হবে, মানুষের আত্মমর্যাদা উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। অনেকেই বলেন, শিক্ষার সৌন্দর্য হলো কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ণয় করার সক্ষমতা অর্জন করা। দুর্নীতি দমন কমিশন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি প্রতিরোধে নিরলসভাবে কাজ করছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ যদি আমরা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে এর নির্যাস হচ্ছে তরুণদের টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করা। দুর্নীতি দমন কমিশন তরুণ শিক্ষার্থীদের মননে নৈতিক মূল্যবোধ গ্রথিত করার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, পরিণত মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতার পরিবর্তন করা অত্যন্ত জটিল। তবে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন অপরিহার্য। দুর্নীতি দমন কমিশন এ লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। যদিও এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে তরুণদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তাদের মানসিকতায় নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এই কৌশলের অংশ হিসেবেই দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে। সাংবৎসরিক ভিত্তিতে বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীদের মননে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি গ্রথিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কর্মপ্রয়াসে সকলের সমন্বিত অংশগ্রহণ জরুরি। এসব সৃজনশীল কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা দুদকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং হয়রানিমুক্ত সরকারি পরিষেবা নিশ্চিত করতে কমিশন ২০১৭ সালে কমিশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করে। প্রাতিষ্ঠানিক টিম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, জনহয়রানির উৎস ও কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। এই প্রাতিষ্ঠানিক টিমের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে আলোচনা, বিভিন্ন নথি পর্যালোচনা, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান বিশ্লেষণ, সরেজমিনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন, গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং কমিশনের গোয়েন্দা সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করে থাকে। ২০১৯ সালে কমিশন কর্তৃক ০৮টি প্রাতিষ্ঠানিক টিমের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এসব সুপারিশ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হলে এসকল খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে, সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে জনহয়রানি হ্রাস পাবে এবং সরকারি দপ্তরসমূহে বিদ্যমান কোনো কোনো অব্যবস্থাপনা অনেকাংশে কমে আসবে। ইতোমধ্যে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এসব প্রতিবেদনের উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম পুনঃপর্যালোচনা করবে।

কমিশন দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ, দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা এবং সর্বোপরি সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির অভিপ্রায় নিয়ে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশনের এ কার্যক্রমে কিছুটা হলেও মানুষের মনে আশা জাগিয়েছে। হয়তো এ কারণেই কমিশনে সাধারণ মানুষের করা অভিযোগের সংখ্যা বাড়ছে। মানুষ কমিশনকে তাদের অভিযোগ জানানোর প্লাটফর্ম হিসেবে মনে করছে। হয়তো সুদিন আসছে, দুর্নীতির কালো ছায়া ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে। হয়তো একসময় অপরাধীরা অনুপার্জিত আয় ভোগ করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্নীতিমুক্ত যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার বাস্তবরূপ হয়তো একদিন প্রস্ফুটিত হবে।

বিগত বছরগুলোতে কমিশন মোটামুটি নির্ধারিত সময়েই অথবা স্বল্প বিলম্বে বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে পেশ করেছিল। কিন্তু এ বছর মহামারী করোনার প্রকোপের কারণে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিলে বিলম্ব হয়েছে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের কারণে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। আমি আশা করি আগামীতে নির্ধারিত সময়েই কমিশন এ প্রতিবেদন দাখিল করতে সক্ষম হবে। এই প্রতিবেদনে কোনো ভুল তথ্য বা কোনো প্রকার অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হলে বা প্রতিবেদনে অসাবধানতাবশত কোনো বিরূপ মন্তব্য থাকলে দুদকের মহাপরিচালক (প্রশাসন) বরাবর যোগাযোগ করা হলে দুদক তা সংশোধনের ব্যবস্থা করবে।

পরিশেষে দুর্নীতি দমন কমিশনের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ২০১৯ সালে দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও উত্তম চর্চার বিকাশে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করেছেন তাদের প্রত্যেককে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ইকবাল মাহমুদ, পিএইচডি)
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

১ম অধ্যায়

দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

১.১ ভূমিকা
১.২ অনুসন্ধান
১.৩ তদন্ত
১.৪ প্রাতিষ্ঠানিক টিম
১.৫ প্রসিকিউশন
১.৬ গ্রেফতার সংক্রান্ত

দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

১.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে বহুমাত্রিক কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। কৌশলের অংশ হিসেবে কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দুর্নীতির বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করা। কারণ এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই কমিশন অনুসন্ধান কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নেয়। সাধারণ জনগণ, সংবাদ মাধ্যমই তথ্যের অন্যতম উৎস। এসবের পাশাপাশি কমিশন নিজস্ব গোয়েন্দা ইউনিটের মাধ্যমে দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করছে এবং তা থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের অনুসন্ধানও করা হচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুসারে দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্ব-উদ্যোগে বা দুর্নীতির শিকার ব্যক্তি বা তার পক্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে দুদক আইনের তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করা কমিশনের আইনি দায়িত্ব।

কমিশন দুর্নীতি দমনে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রসিকিউশনের মাধ্যমে প্রকৃত অভিযুক্তদের যথাযথ শাস্তির প্রত্যাশায় আইন-আদালতে সোপর্দ করে থাকে। কমিশন প্রতিটি অভিযোগকে সমগুরুত্ব প্রদান করে থাকে। দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, কমিশনের বিবেচ্য বিষয় হলো অভিযোগের বস্তুনিষ্ঠতা, সত্যতা, দালিলিক প্রমাণাদি, দুদক আইন, ২০০৪ ও দেশের প্রচলিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ। কমিশন ইতোমধ্যে অভিযোগ অনুসন্ধানের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণে নম্বরভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। নির্ধারিত নম্বরের কম পেলে সেসব অভিযোগের ওপর কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

১.১.১ দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ

বর্তমানে ডিজিটাল এবং সনাতন উভয় মাধ্যমেই দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করা হয়। দেশের যে কোনো নাগরিক দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অভিযোগ কমিশনে দাখিল করতে পারেন। দুদক আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ)-এর তফসিলভুক্ত অপরাধ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে কমিশন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কমিশনের তফসিল বহির্ভূত অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কিংবা বিভাগে অভিযোগটি প্রেরণের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরকারি কর্মচারী/ ব্যাংকার/ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তি সরকারি কাজের জন্যে ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

১.১.২ দুদকের যে সকল কার্যালয়ে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে

ক) চেয়ারম্যান/কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

খ) সচিব/মহাপরিচালক (অপরাধটি যে অনুবিভাগের অধীন) দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

গ) বিভাগীয় পরিচালক (অপরাধটি যে বিভাগের অধীন সংঘটিত), দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা/চট্টগ্রাম/রংপুর/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট।

ঘ) উপপরিচালক (অপরাধটি যে সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের অধীন সংঘটিত), দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১/ঢাকা-২/টাঙ্গাইল/ফরিদপুর/ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম-১/চট্টগ্রাম-২/রাঙ্গামাটি/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাজশাহী/বগুড়া/পাবনা/রংপুর/দিনাজপুর/খুলনা/কুষ্টিয়া/যশোর/বরিশাল/পটুয়াখালী/সিলেট/হবিগঞ্জ।

ঙ) যেকোনো নাগরিক কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬-এ বিনা খরচে যেকোনো টেলিফোন থেকে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

চ) যেকোনো নাগরিক কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধের বিষয়ে ই-মেইলের মাধ্যমে chairman@acc.org.bd-তে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

১.১.৩ অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ

জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের আইনের আওতায় আনার দায়িত্ব কমিশনের। এ দায়িত্ব পালনে কমিশনের নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্য ছাড়াও যে কোনো নাগরিক অবৈধ সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। কোনো ব্যক্তি অবৈধ অর্থ বা সম্পদ অর্জন করে থাকলে তার নাম, পদবি/পেশা ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত তথ্যসহ অভিযোগ করা হলে দুদক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে:

- স্থাবর সম্পদের (বাড়ি, ফ্ল্যাট, প্লট, জমি, গাড়ি ইত্যাদি) অবস্থান, পরিমাণ, আনুমানিক মূল্যসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা;
- ব্যাংক হিসাব, শেয়ার, এফডিআর, সঞ্চয়পত্রসমূহের সুনির্দিষ্ট তথ্য;
- গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর/মডেল, ক্রয়ের সময়কাল;
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, ধরন ও সুনির্দিষ্ট ঠিকানা;
- বৈধ আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন জীবনযাপন সংক্রান্ত বিবরণ; এবং

সরকারি অর্থ/সম্পদ আত্মসাৎ ও ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে কমিশন কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তবে কমিশনে অভিযোগ প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকা প্রয়োজন:

- আত্মসাৎকৃত অর্থ/সম্পদের পরিমাণ ও আত্মসাৎ-সংঘটনের সময়;
- যেসব দায়িত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে কখন, কীভাবে আত্মসাৎ ঘটেছে তার বর্ণনা;
- আত্মসাতের সাথে পরোক্ষ/নেপথ্যে সহায়তাকারীদের পরিচয়/বিবরণ এবং
- এ ঘটনায় সম্পৃক্ত কাগজ/নথিপত্রাদি।

ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত ও অন্যান্য অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি কখন কীভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে লাভবান হয়েছে বা অন্যকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বা রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদের ক্ষতি করেছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে। তবে অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং তার সমর্থনে তথ্য ও উপাত্ত থাকতে হবে। ন্যূনতম নিম্নোক্ত তথ্যগুলো আবশ্যক :

- অভিযোগের বিবরণ ও সংঘটিত হওয়ার সময়কাল;
- অভিযোগের সমর্থনে তথ্য উপাত্ত এবং
- অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পদবি (যদি থাকে) ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা।
- সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন বা অর্থ পাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য।

অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশন নিম্নের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে থাকে

- অভিযোগটি কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধ কি-না;
- অভিযোগটি সুনির্দিষ্ট ও তথ্যভিত্তিক কি-না;
- অপরাধ সংঘটনের সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে কি-না;
- অভিযুক্ত ব্যক্তির অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্টতা;
- অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখ আছে কি-না;
- অভিযোগের জনগুরুত্ব ও মাত্রা;
- অভিযোগে আর্থিক সংশ্লেষের পরিমাণ;
- অভিযোগকারীর নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখ আছে কি-না;
- অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন পর্যালোচনা করে দেখা হয় যাতে অভিযোগটি আদালতে প্রমাণযোগ্য কি-না।

১.১.৪ অভিযোগ এবং তার যাচাই-বাছাই পরর্বতী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ অনুযায়ী কমিশনে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ বিধি অনুসরণ করে কমিশনে অভিযোগ গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত 'অভিযোগ যাচাই-বাছাই সেল' রয়েছে। এই সেল বিভিন্ন উৎস থেকে কমিশনে আসা অভিযোগগুলো যাচাই-বাছাই করে থাকে। ২০১৭ সালে কমিশন অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নম্বরভিত্তিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। তাই অভিযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে দুদকের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ নেই। নির্ধারিত নম্বর না পেলে কোনো অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

২০১৯ সালে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির সম্মানিত নাগরিক, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ২১,৩৭১টি অভিযোগ আসে, যার মধ্যে ১,৭১০টি অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত হয় এবং ৩,৬২৭টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সারণি-১ এ ২০১৯ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরর্বতী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান এবং সারণি-২ এ ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।

সারণি-১: ২০১৯ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরর্বতী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

প্রাপ্ত অভিযোগের উৎস		মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	নথিভুক্ত অভিযোগের সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ
জনসাধারণ (সরাসরি প্রধান কার্যালয়ে লিখিত)	১৫,৫৫৭	২১,৩৭১	১,৭১০	১৬,০৩৪	৩,৬২৭
সরকারি দপ্তর/সংস্থা	৪৯				
বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা	২৩২				
পত্রিকা/টিভি প্রতিবেদন	৫৯৪				
কমিশনের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ	১,৯৯৮				
হটলাইন	১,৮৪৩				
অন্যান্য (আদালত, ফেসবুক, ইমেইলসহ)	১,০৯৮				

সারণি-২: ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক চিত্র

সাল	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ
২০১৫	১০,৪১৫	১,২৪০	১৬৫
২০১৬	১২,৯৯০	১,০০৭	৫৮৮
২০১৭	১৭,৯৮৩	৯৩৭	৩৭৭
২০১৮	১৬,৬০৬	১,২৬৫	১,৪০৪
২০১৯	২১,৩৭১	১,৭১০	৩,৬২৭

বিগত ৫ বছরের অভিযোগ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৯ সালে কমিশনে সর্বাধিকসংখ্যক লিখিত অভিযোগ দাখিল হয়েছে। এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৯ সালেই সর্বাধিক সংখ্যক অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া একই বছরে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে ক্রমাগতভাবে দুদকে জমা হওয়া অভিযোগের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া- দুদকের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বৃদ্ধির ফলাফল বলে প্রতীয়মান হয়। কমিশন মনে করে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস কিছুটা হলেও বেড়েছে। হয়তো সে কারণেই ২০১৫ সালের চেয়ে ২০১৯ সালে দ্বিগুণেরও বেশি সংখ্যক অভিযোগ পাওয়া গেছে।

চিত্র-১: ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ , ২০১৮ ও ২০১৯ সালে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগের পরিসংখ্যান

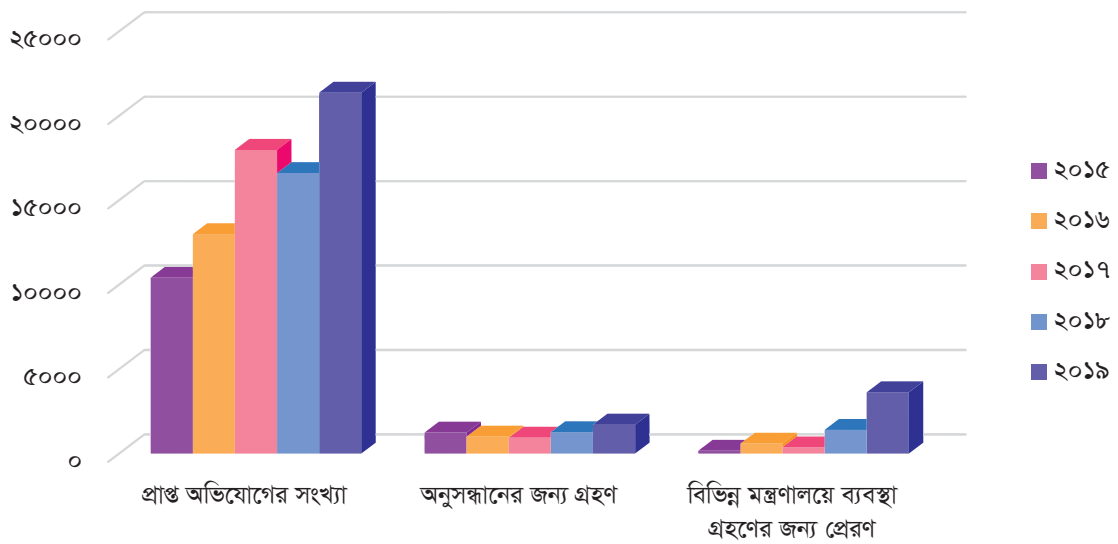

১.২. অনুসন্ধান

১.২.১ অনুসন্ধানের আইনগত ভিত্তি

অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমেই এর ওপর আইনি কার্যক্রম শুরু করা হয়। দুদক আইন, ২০০৪ এর ১৭ (ক) ধারা অনুসারে কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান পরিচালনা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। অনুসন্ধান হচ্ছে, প্রাপ্ত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম। দুদক আইনের ১৯ ও ২০ ধারায় ও তদন্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমে দুদক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সে লক্ষ্যে দুদক তিনটি অনুবিভাগ (তদন্ত অনুবিভাগ, বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ এবং মানিলন্ডারিং ও পরিদর্শন অনুবিভাগ)-এর মাধ্যমে অনুসন্ধানসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তদন্ত অনুবিভাগের শাখা ও অধিশাখাসমূহ ৮ (আট)টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২(বাইশ)টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়-কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজ তত্ত্বাবধান করে।

অনুসন্ধানের জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোর এখতিয়ার কমিশনের বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগের। এর আওতাধীন বিষয় হচ্ছে: প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অনুসন্ধান, ফাঁদ পেতে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে গ্রেফতার, বৃহদাকারের আর্থিক দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত কার্যক্রম।

মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের কাজ হচ্ছে বিদ্যমান মানিলন্ডারিং আইনে কেবল ঘুষ ও দুর্নীতিসম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত করা। এখানে উল্লেখ্য যে, এই আইনের অবশিষ্ট ২৬ টি সম্পৃক্ত অপরাধসংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-সহ অন্যান্য সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

১.২.২ কমিশন কর্তৃক গৃহীত অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ ২০১৯ সালের অনুসন্ধান কার্যক্রম

কমিশন পূর্ববর্তী বছরসমূহের বিপুল সংখ্যক অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান পরিচালনায় বিশেষ কার্যক্রম হাতে নেয়। নির্ধারিত সময়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কর্মকর্তাদের কমিশনের কর্মকৌশল অনুসারে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ ২০১৯ সালে মোট অনুসন্ধান সংখ্যা ছিল ৪,৮৬১টি। কমিশন ২০১৯ সালে ১,১০৬টি অনুসন্ধান সাফল্যের সাথে নিষ্পত্তি করেছে। নিষ্পত্তিকৃত এসব অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে কমিশনের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণ ৩৬৩টি মামলা দায়ের করেছে। অবশিষ্ট সমাপ্তকৃত অনুসন্ধানগুলোর ফলাফল কমিশনের রেকর্ডের জন্য পরিসমাপ্তির মাধ্যমে এবং অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সারণি-৩ ও চিত্র-২ এ ২০১৯ সালের সামগ্রিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।

সারণি-৩: ২০১৯ সালের অভিযোগের অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

২০১৯ সালের শুরুতে অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান	২০১৯ সালে গৃহীত অনুসন্ধান	মোট অনুসন্ধান	২০১৯ সালে সম্পন্ন অনুসন্ধান	মামলা দায়ের	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২,৮৮৭	১,৯৭৪	৪,৮৬১	১,১০৬	৩৬৩*	৭১৬	৭৫

*একই নথি থেকে একাধিক মামলার উদ্ভব হয়েছে।

চিত্র-২: ২০১৯ সালের সামগ্রিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

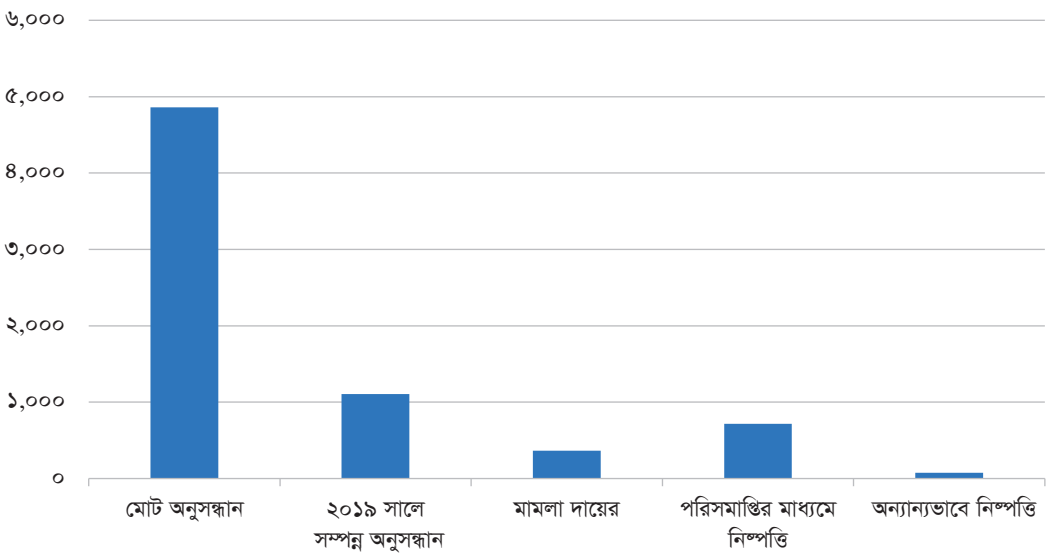

সারণি-৪: ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে কমিশনের মামলা দায়েরের পরিসংখ্যান

সাল	মামলা দায়েরের সংখ্যা
২০১৬	৩৫৯
২০১৭	২৭৩
২০১৮	২১৬
২০১৯	৩৬৩

বিগত ৪ বছরে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৯ সালে কমিশন সর্বাধিক সংখ্যক মামলা দায়ের করেছে। কমিশন প্রথম থেকেই মানসম্মত (প্রমাণের সপক্ষে পর্যাপ্ত দালিলিক প্রমাণাদি রয়েছে) মামলা দায়েরের বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করেছে। তারপরও ২০১৯ সালে কমিশন সর্বাধিক সংখ্যক মামলা দায়ের করতে সমর্থ হয়েছে। বেশিসংখ্যক মামলা দায়েরের মাধ্যমে কমিশন দুর্নীতিবিরোধী নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গতিশীল করার চেষ্টা করেছে।

চিত্র-৩: ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে কমিশনের মামলা দায়েরের পরিসংখ্যান

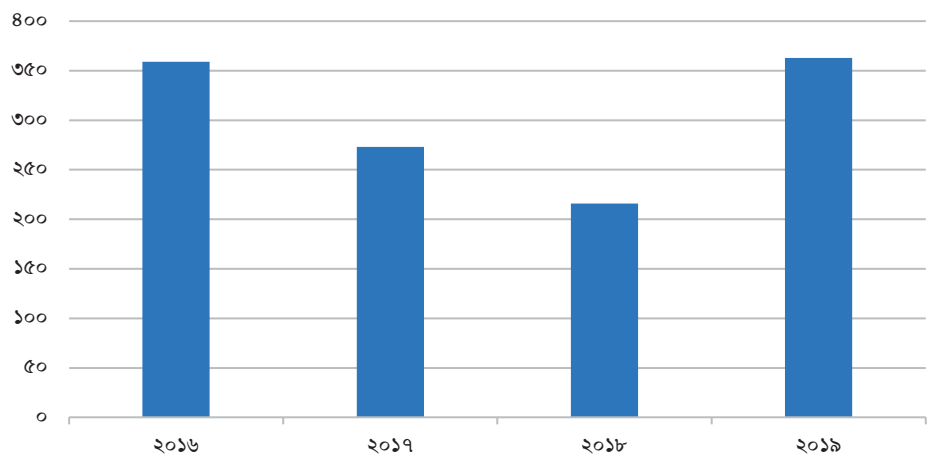

১.২.৩ অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধানের তথ্য

জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দুদকের আইনি দায়িত্ব। **সম্পদ সংক্রান্ত** সর্বমোট ১,৭১৪টি অনুসন্ধানের মধ্যে ২০১৯ সালে গৃহীত ৭২৩টি অনুসন্ধান (প্রায় ৪২%) এবং বাকি ৯৯১টি অনুসন্ধান (প্রায় ৫৮%) বিগত বছরসমূহের। এ বছর কমিশন ৩৮৮টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে এবং সম্পাদিত অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে ১৫৪টি মামলা দায়ের করেছে। সারণি-৫ ও চিত্র-৪ এ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান পরিচালনা ও এসব অনুসন্ধানের ফলাফল বিষয়ে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৫: অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

২০১৯ সালের শুরুতে পেন্ডিং অনুসন্ধান	২০১৯ সালে গৃহীত অনুসন্ধান	মোট অনুসন্ধান	২০১৯ সালে সম্পন্ন অনুসন্ধান	মামলা দায়ের	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯৯১	৭২৩	১,৭১৪	৩৮৮	১৫৪ *	১৬৮	৯৫

*একই নথি থেকে একাধিক মামলার উদ্ভব হয়েছে।

চিত্র-৪: অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান পরিচালনা ও এসব অনুসন্ধানের ফলাফল বিষয়ে দুদকের কার্যক্রম

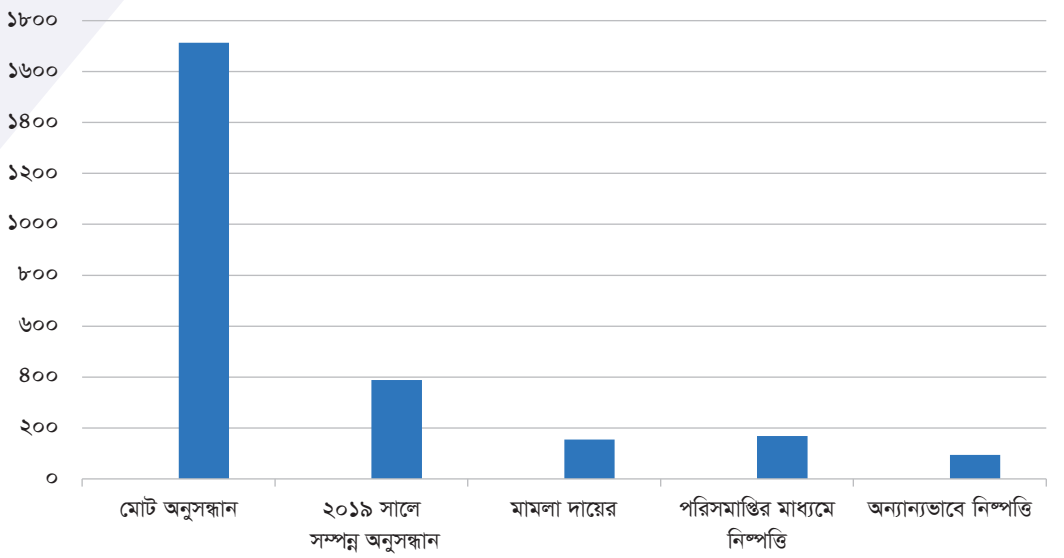

১.২.৪ মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান

২০১৯ সালে পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন মানিলন্ডারিং অনুসন্ধানসহ মোট ৮০টি অনুসন্ধানের মধ্যে কমিশন ৩৩টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে, যার ফলে একই বছরে ০৭টি মামলা দায়ের, ০৯টি অভিযোগ পরিসমাপ্তি এবং ১৭টি অভিযোগ অন্য সংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সারণি-৬ ও চিত্র-৫ এ মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান পরিচালনা ও এসব অনুসন্ধানের ফলাফল বিষয়ে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৬: ২০১৯ সালে দুদকের মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

২০১৯ সালের প্রারম্ভে অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান	২০১৯ সালে গৃহীত অনুসন্ধান	মোট অনুসন্ধান	২০১৯ সালে সম্পন্ন অনুসন্ধান	মামলা দায়ের	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮০	৭৩	১৫৩	৩৩	০৭	০৯	১৭

চিত্র-৫: ২০১৯ সালে দুদকের মানিলন্ডারিং অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

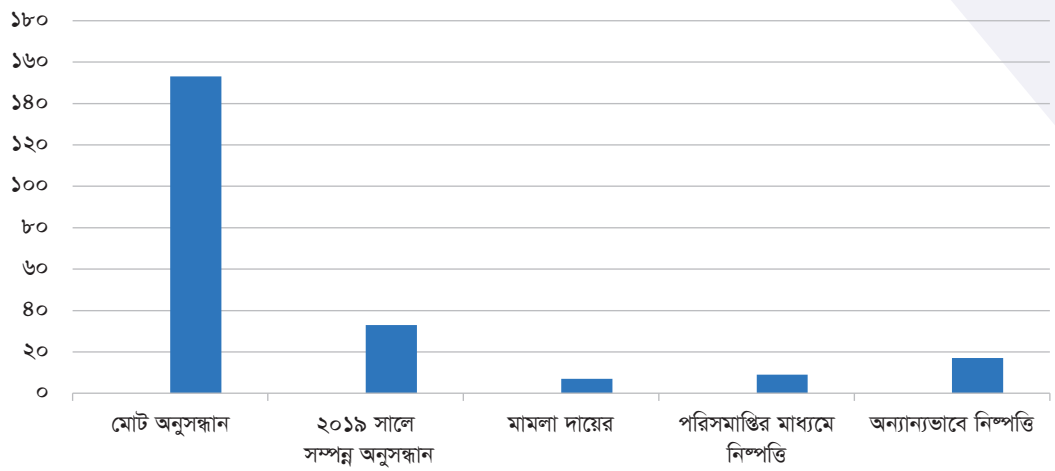

১.৩ তদন্ত

ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে তদন্ত সম্পন্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং আইনি বিধি-বিধানের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তদন্ত কার্য নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে না। তবে কমিশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে নিয়মিতভাবে নির্ধারিত সময়ে মামলার তদন্তের বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতার ভিত্তিতে অনুসন্ধান শেষে মামলা দায়েরের পর কমিশন অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়। কমিশন পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সন্তুষ্ট হলেই কেবল অভিযোগপত্র কিংবা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন দেয়। অভিযোগপত্র অনুমোদনের ক্ষেত্রে অভিযোগের বস্তুনিষ্ঠতা, দালিলিক প্রমাণাদি, সাক্ষ্য এবং বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে সম্পূর্ণ নির্মোহ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১.৩.১ তদন্তের আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলা তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার দায়িত্ব কমিশনের। কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কমিশন নিরলসভাবে কাজ করছে। দুর্নীতির অপরাধসমূহের তদন্ত পরিচালনা কমিশনের প্রধান সংবিধিবদ্ধ কার্য (দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৭(ক) ধারা)। তদন্তের ফলাফলই দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের ভিত্তি। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ১৯ ও ২০ ধারা অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমে দুদককে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সে লক্ষ্যে দুদক তিনটি অনুবিভাগের মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে যথা: তদন্ত অনুবিভাগ, বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ এবং মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ।

তদন্ত অনুবিভাগ এবং মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের শাখা ও প্রশাখাসমূহ আটটি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের তদন্ত কাজ তত্ত্বাবধান করে। এছাড়াও তদন্ত অনুবিভাগ বিভিন্ন উৎস থেকে কমিশনে আসা মামলার তদন্ত করে থাকে। তদন্তের জন্যে নির্ধারিত বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলো দেখে কমিশনের বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ।

১.৩.২ পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০১৯ সালের তদন্ত কার্যক্রম

কমিশনের কর্মকৌশলের আলোকে নির্ধারিত সময়ে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কর্মকর্তাদের বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কমিশন নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি তদন্ত সম্পন্ন করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে নিয়মিতভাবে (সময়াবদ্ধ) নির্ধারিত সময়ে মামলার তদন্তের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০১৯ সালে মোট তদন্ত সংখ্যা ছিল ১,৭২৯টি। কমিশন ২০১৯ সালে ৪৭৩টি তদন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে। সম্পন্ন এসব তদন্তের উপর ভিত্তি করে কমিশন ২৬৭টি মামলায় চার্জশিট বা অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। বাকি সম্পন্ন তদন্তগুলোর মধ্যে ১২১টি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আইনি বাধ্যবাধকতায় ৮৮টি তদন্ত অন্য সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। সারণি-৭ ও চিত্র-৬ এ ২০১৯ সালের সামগ্রিক তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৭: ২০১৯ সালের অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

২০১৯ সালের প্রারম্ভে পেন্ডিং তদন্ত	২০১৯ সালে গৃহীত তদন্ত	মোট তদন্ত	২০১৯ সালে সম্পন্ন তদন্ত	চার্জশিট দাখিল	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১,১১৮	৬১১	১,৭২৯	৪৭৩	২৬৭	১২১	৮৮

*একই নথি থেকে একাধিক তদন্ত উদ্ভূত হয়েছে।

চিত্র-৬: ২০১৯ সালের সামগ্রিক তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

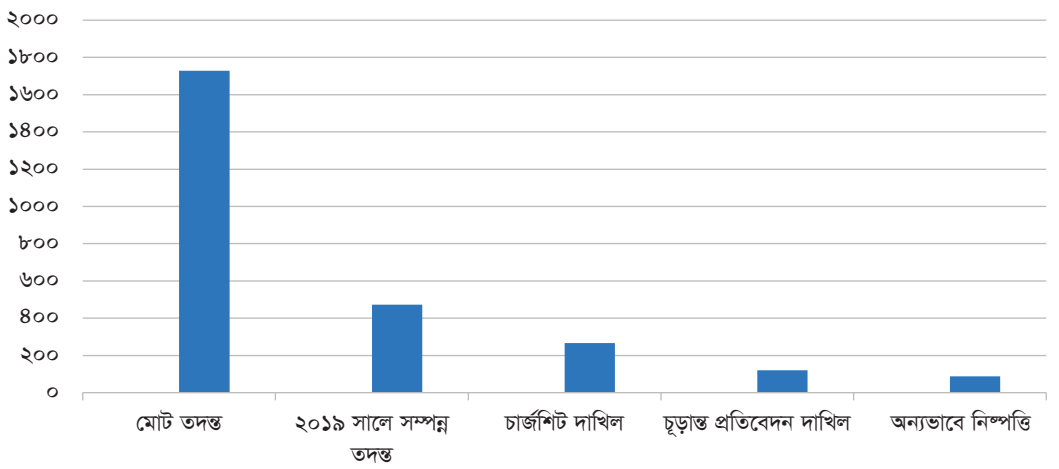

সারণি-৮ ও চিত্র-৭ এ ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের তদন্ত কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে বিগত চার বছরের তথ্য অভিযোগপত্র অনুমোদনের তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৮: ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে কমিশনের তদন্ত কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	চার্জশিট অনুমোদন
২০১৬	৫৩৫
২০১৭	৩৮২
২০১৮	২৩৬
২০১৯	২৬৭

বিগত চার বছরে কমিশন কর্তৃক অনুমোদনকৃত চার্জশিটের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১৯ সালে চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা ২০১৮ সাল হতে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশন মানসম্মত (প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত দালিলিক প্রমাণাদি রয়েছে) মামলা তদন্তের বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করায় অভিযোগপত্রের সংখ্যা খুব বেশি বৃদ্ধি পায়নি। কমিশন মনে করে, নিখুঁত তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের প্রসিকিউট করা গেলে বিচারিক প্রক্রিয়ায় তাদের আইনি জালে আবদ্ধ করা সহজ হবে। কমিশন তদন্তের গুণগত মান নিশ্চিতে প্রশিক্ষণসহ বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্র-৭: ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে কমিশনের তদন্ত কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

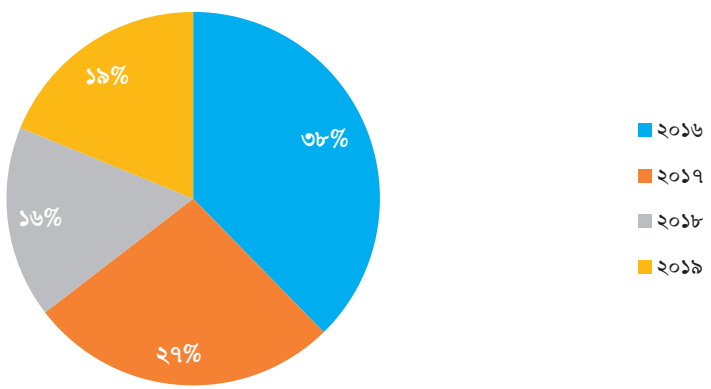

১.৩.৩ অবৈধ সম্পদের তদন্ত

জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দুদকের আইনি দায়িত্ব। ঘুষ, দুর্নীতি কিংবা অন্য কোনো অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনকারীদের দুদক আইন, ২০০৪ এর ২৬ ও ২৭ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সম্পদ সংক্রান্ত মোট ৫৬২টি তদন্তের মধ্যে ২০১৯ সালে গৃহীত ১৬৫টি তদন্ত (প্রায় ২৯%) এবং অবশিষ্ট ৩৯৭টি তদন্ত (৭১%) বিগত বছরসমূহের। এ বছর কমিশন সম্পদ সংক্রান্ত ১২৩টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং সম্পাদিত তদন্তের উপর ভিত্তি করে ৭৮টি চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে।

সারণি-৯ ও চিত্র-৮ এ সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনা ও এসব তদন্তের ফলাফল বিষয়ে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৯: সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

২০১৯ সালের প্রারম্ভে অনিষ্পন্ন তদন্ত	২০১৯ সালে গৃহীত তদন্ত	মোট তদন্ত	২০১৯ সালে সম্পন্ন তদন্ত	চার্জশিট দাখিল	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৯৭	১৬৫	৫৬২	১২৩	৭৮	৩৪	১১

চিত্র-৮: অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত বিষয়ক কার্যক্রম

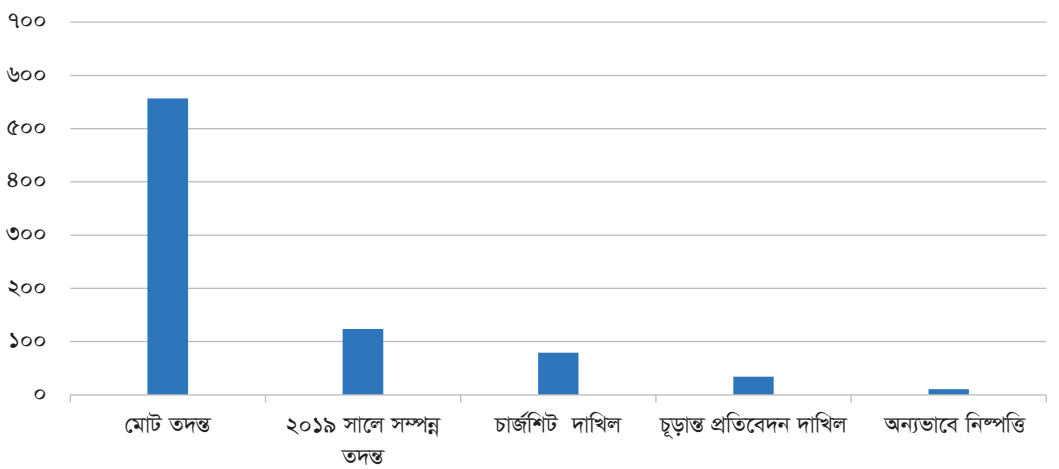

১.৩.৪ মানিলন্ডারিং তদন্ত

বিদ্যমান মানিলন্ডারিং আইন অনুসারে মানিলন্ডারিং মামলা পরিচালনার একক দায়িত্ব দুদকের নেই। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ একাধিক সংস্থা মানিলন্ডারিং মামলা পরিচালনা করছে। দুদক কেবল ঘুষ ও দুর্নীতিসম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধ তদন্তের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বাকি ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের তদন্ত অন্যান্য সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

কমিশন ২০১৯ সালের পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন মানিলন্ডারিং তদন্তসহ মোট ৪৫টি তদন্তের মধ্যে ১৮টি মামলার তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং ১৩টি মামলার চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে। বাকি মামলাগুলোর মধ্যে তিনটি মামলা কমিশনের আওতা বহির্ভূত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং দুইটি মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন মানিলন্ডারিং মামলা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তদন্ত করে থাকে। কমিশন কর্তৃক তদন্ত করা হয়েছে এমন ১১টি মামলা ২০১৯ সালে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে বিচার সম্পন্ন হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালত ১১টি মামলাতেই আসামিদের সাজা প্রদান করেছেন।

সারণি-১০ ও চিত্র-৯ এ মানিলন্ডারিং তদন্ত পরিচালনা ও এসব তদন্তের ফলাফল বিষয়ে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-১০: মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

২০১৯ সালের প্রারম্ভে অনিষ্পন্ন তদন্ত	২০১৯ সালে গৃহীত তদন্ত	মোট তদন্ত	২০১৯ সালে সম্পন্ন তদন্ত	চার্জশিট দাখিল	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪	২১	৪৫	১৮	১৩	০২	০৩

চিত্র-৯: মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের চিত্র

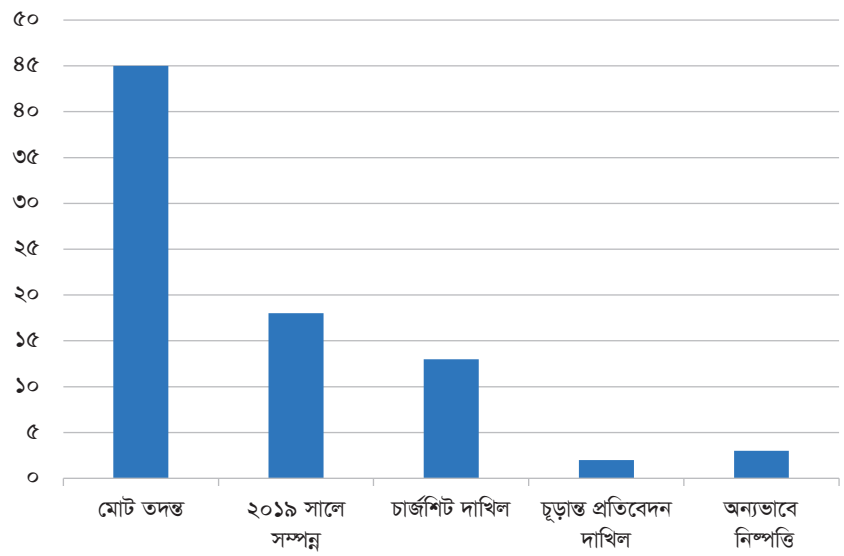

১.৩.৫ ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়

ঘুষ সংস্কৃতির অবসান এবং দুর্নীতির উৎসমূল নির্মূল করার লক্ষ্যেই কমিশন ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে। সাধারণত সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবার বিনিময়ে ঘুষ বা উপঢৌকন দাবি করলে কমিশন থেকে অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ফাঁদ মামলা পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়, এ আলোকে ঘুষ দাবিকারী কর্মকর্তাদের হাতে-নাতে ধরতে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতে-নাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সারণি-১১ ও চিত্র-১০-এ ২০১৯ সালে ফাঁদের ঘটনাসমূহ তদন্তে দুদকের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-১১: ২০১৯ সালে ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রম

২০১৯ সালের প্রারম্ভে অনিষ্পন্ন তদন্ত	২০১৯ সালে গৃহীত তদন্ত	মোট তদন্ত	২০১৯ সালে সম্পন্ন তদন্ত	চার্জশিট দাখিল	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল
১	২	৩	৪	৫	৬
২	১৬	১৮	০৮	০৮	-

ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত শতভাগ মামলায় অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।

চিত্র-১০: ২০১৯ সালে ফাঁদের ঘটনাসমূহ তদন্তে দুদকের কার্যক্রম

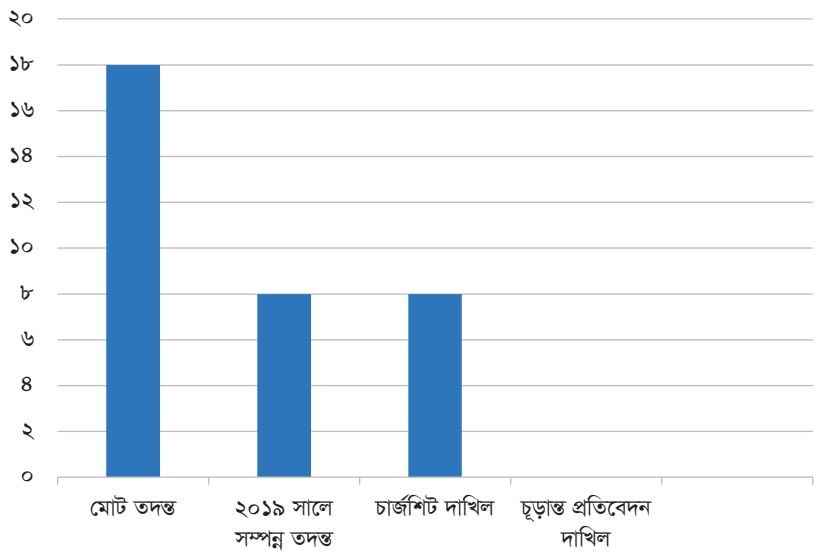

সারণি-১২ ও চিত্র-১১ ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণি-১২: ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের ফাঁদ মামলাসমূহের পরিসংখ্যান

সাল	ফাঁদ মামলার সংখ্যা
২০১৫	০৪
২০১৬	১৩
২০১৭	২৪
২০১৮	১৫
২০১৯	১৬

সারণি-১২ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৯ সালে ১৬টি ফাঁদ মামলা পরিচালনা করা হয়েছে। ফাঁদ মামলার সংখ্যা গত বছরের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফাঁদ মামলা পরিচালনার পাশাপাশি কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরোধমূলক দুর্নীতিবিরোধী সফল অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব অভিযানের মাধ্যমেও বেশকিছু দুর্নীতির ঘটনা ঘটার আগেই তা প্রতিহত করা গেছে।

চিত্র-১১: ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র

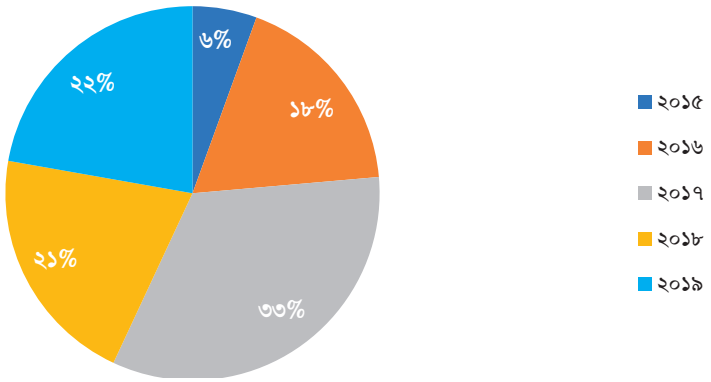

১.৪ প্রাতিষ্ঠানিক টিম

সরকারি সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াকে পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে ঘুষ, দুর্নীতি, দীর্ঘসূত্রতা এবং জনহয়রানি লাঘবের লক্ষ্যে কমিশন প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করে থাকে। মূলত কমিশন প্রত্যাশা করে, দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদানে অনিয়ম, দুর্নীতি, দীর্ঘসূত্রতা নিরসনে গঠনমূলকভাবে দায়িত্ব পালন করবে।

স্ব-উদ্যোগে দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণের ভিত্তিতে কমিশনের অনুসন্ধানের ক্ষমতা যেমন রয়েছে, পাশাপাশি আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করা এবং তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ পেশ করার দায়িত্বও রয়েছে। আইনি প্রেক্ষাপটে ২০০৮ সাল থেকে দুদক দেশে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অনুসন্ধান ও তদন্ত শুরু করে।

কমিশন ২০১৭ সালে ২৫টি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে ২৫টি প্রাতিষ্ঠানিক টিম গঠন করে। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে যথাক্রমে: তিতাস গ্যাস, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স, কাস্টমস, ভ্যাট এন্ড এক্সারইজ, আয়কর বিভাগ, ওয়াসা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসহ রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ, সমুদ্র এবং স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা (ভূমি অধিগ্রহণ (এলএ) ও রাজস্ব (এসএ) শাখা), পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা অধিদপ্তর। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি নিয়ে গঠিত সব টিমের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। সাধারণত মহাপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ প্রাতিষ্ঠানিক টিমসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

প্রতিটি টিমকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান আইন, বিধি, পরিচালনা পদ্ধতি, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ/অপচয়ের দিকসমূহ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে এসব প্রতিষ্ঠানের জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সফলতা ও সীমাবদ্ধতা, আইনি জটিলতা, সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি ও দুর্নীতির কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা বন্ধে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব পেশ করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার আলোকে ২০১৯ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ, ওয়াসা, তিতাস গ্যাস, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট টিমসমূহ এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির উৎসসমূহ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে সুপারিশমালা প্রণয়নপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন পেশ করে। কমিশন আলোচনা-পর্যালোচনা করে বাস্তবসম্মত কয়েকটি সুপারিশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে প্রেরণ করেছে। কমিশন বিশ্বাস করে, এসকল সুপারিশ বাস্তবায়নযোগ্য, যা অবশ্যই এসব দপ্তরে সরকারি পরিষেবা প্রদানে ঘুষ, দুর্নীতি, হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রতা হ্রাস করতে পারে।

১.৫ প্রসিকিউশন

১.৫.১ মামলা পরিচালনার আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের আইন-আমলে এনে তাদের অপরাধ বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করা দুদকের অন্যতম আইনি কর্তব্য।

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্তের পাশাপাশি প্রসিকিউটিং সংস্থা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। কমিশন প্রতিটি মামলাকে সমগুরুত্বের সঙ্গে পরিচালনা করছে। মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশন দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ); মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এবং এর সংশোধনীসমূহ); দণ্ডবিধি-১৮৬০; ফৌজদারি কার্যবিধি-১৮৯৮; দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭; ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮; সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ধারা ১৭(খ) অনুযায়ী কমিশন তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার উপর ভিত্তি করে মামলা দায়ের ও মামলা পরিচালনা করতে পারে।

কমিশন যে সকল অপরাধের মামলা পরিচালনা করতে পারে

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ) এর তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ; ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এবং এর সংশোধনীসমূহ); ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির (পেনাল কোড) ১৬১-১৬৯, ২১৭, ২১৮, ৪০৯-এর অধীন অপরাধসমূহ এবং ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক ধারার অধীনে কোনো অপরাধ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা বা ব্যাংকের কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে অপরাধসমূহ ও ১০৯ ধারা (দুষ্কর্মে সহায়তা), ১২০খ ধারা (দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র) এবং ৫১১ ধারা (দুষ্কর্মের প্রচেষ্টা) এবং এই ধারার (ক), (খ) বা (গ), (ঘ) উপধারা সংশ্লিষ্ট সংঘটিত যে কোনো অপরাধকে নির্দেশ করা হয়েছে।

দুদক আইন, ২০০৪-এর ৩২ (ক) ধারা অনুযায়ী এসব অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি প্রদানের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৮(১) ধারা মোতাবেক এই আইনের অধীনে ও উহার তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ কেবল স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য হবে। ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ এর ২৮(২) ধারায় বলা আছে, উপধারা ৬(৫) ব্যতিরেকে ৬ নং ধারাটি দুর্নীতি মামলার আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ ও দুদক আইন, ২০০৪-এর মধ্যে সাংঘর্ষিক কোন বিষয় সৃষ্টি হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে [দুদক আইনের ২৮(৩) ধারা]।

কমিশনের আইন অনুবিভাগ আইনসংক্রান্ত বিষয়াবলি তত্ত্বাবধান এবং কমিশনের মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি সংরক্ষণ করে। একজন মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালিত অনুবিভাগটি লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন নামে দুটি আলাদা শাখার মাধ্যমে দুজন পরিচালক তত্ত্বাবধান করেন। এই অনুবিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কমিশনের নিয়োগকৃত আইনজীবীগণ সংশ্লিষ্ট আদালতে কমিশনের মামলাসমূহ পরিচালনা করে থাকেন। দুদক আইন, ২০০৪ অনুযায়ী কমিশনের পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রসিকিউটরসহ নিজস্ব প্রসিকিউশন ইউনিট থাকতে পারবে, যারা বিশেষ আদালতে মামলা পরিচালনা করবেন [ধারা ৩৩(১)]। বর্তমানে বিশেষ জজ আদালতে ও বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে কমিশনের পক্ষে দুর্নীতির মামলা পরিচালনার জন্য কমিশন আলাদা প্যানেলে চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে। ১৩ সদস্যের প্যানেল আইনজীবীদের 'পাবলিক প্রসিকিউটর' বলা হয়, যারা ঢাকার ১৩টি বিশেষ জজ আদালতে দায়িত্ব পালন করছেন। এভাবে ঢাকা বিভাগে ৩৮ জন, চট্টগ্রামে ২৮ জন, রাজশাহীতে ২৩ জন, রংপুর বিভাগে ১৯ জন, খুলনা বিভাগে ২৫ জন, বরিশালে ১৪ জন, সিলেটে ১০ জন এবং ময়মনসিংহে ১৪ জন আইনজীবী কমিশনের হয়ে কাজ করছেন। এদের মধ্যে ৪ জন নারী পাবলিক প্রসিকিউটর রয়েছেন।

১.৫.২ বিচারিক আদালতে মামলা পরিচালনা

বিগত চার বছর দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় সাজার হার প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে। এটা কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা বলা যেতে পারে। কারণ দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নির্ধারণে মামলার সাজার হার একটি অন্যতম নিয়ামক।

শতভাগ মামলায় সাজা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসেবে দুদক কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক আইন অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রতিটি মামলায় সম্পৃক্ত আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং ধার্য তারিখে আইনজীবী ও সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে থাকেন। আইন অনুবিভাগের মাধ্যমেই কমিশন প্রতিটি মামলা পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর নাগাদ বিশেষ জজ আদালতে ৩১৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ২৮২টি (প্রায় ৮৯%) দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়েরকৃত মামলা এবং বাকি ৩৫টি (১১%) বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত। দুদকের দায়েরকৃত ২৮২টি মামলা বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ১৭৭টি মামলায় আসামিদের সাজা হয়েছে। কমিশনের মামলায় সাজার হার ৬৩% (প্রায়) এবং বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলাগুলোতে সাজার হার ৪০%। সারণি-১৩ এ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য দুর্নীতির মামলার একটি পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-১৩: ২০১৯ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য দুর্নীতির মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	২,৮৩০	৪৬৯	৩,২৯৯
বিচার চলমান মামলার সংখ্যা	২,৫৮৪	২৬৫	২,৮৪৯
স্থগিত মামলার সংখ্যা	২৪৬	২০৪	৪৫০
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	২৮২	৩৫	৩১৭
শাস্তি হওয়া মামলার সংখ্যা	১৭৭	১৪	১৯১
খালাস পাওয়া মামলার সংখ্যা	১০৫	২১	১২৬

চিত্র-১২: ২০১৯ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য দুর্নীতি মামলার চিত্র

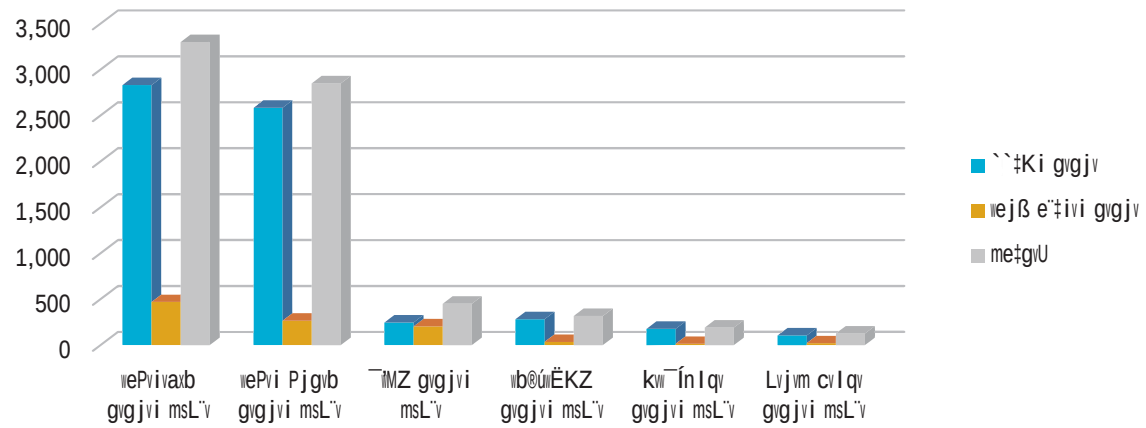

সারণি-১৪: ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের মামলায় সাজার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	দুদকের মামলায় সাজার হার	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলায় সাজার হার
২০১৫	৩৭%	২৫%
২০১৬	৫৪%	৪৫%
২০১৭	৬৮%	৩৯%
২০১৮	৬৩%	৫০%
২০১৯	৬৩%	৪০%

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিগত পাঁচ বছরের মামলায় বিচারিক আদালতের রায়সমূহ (সারণি-১৪) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় ২০১৫ সালে সাজার হার ছিল ৩৭%, ২০১৬ সালে সাজার হার ৫৪%, ২০১৭ সালে সাজার হার ৬৮%, ২০১৮ সালে সাজার হার ৬৩% এবং ২০১৯ সালে সাজার হার ৬৩%। এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৭ সাল থেকে কমিশনের দায়ের করা মামলায় সাজার হার প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে। বিগত ২ বছর সাজার হার একই রয়েছে। এটা কমিশনের ইতিবাচক অর্জন। ২০১৫ সালে যেখানে মামলায় সাজার হার ছিল মাত্র ৩৭%, সেখানে ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ধারাবাহিকভাবে মামলার সাজার হার ৬০%-এর উপরে। যদিও কমিশন চেষ্টা করছে তাদের মামলায় শতভাগ সাজা নিশ্চিত করার।

চিত্র-১৩: ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের মামলায় সাজার চিত্র

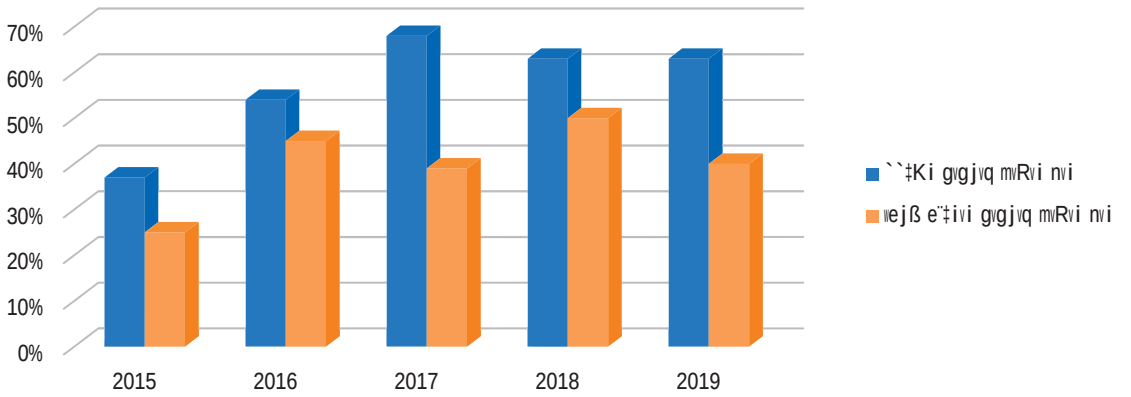

সারণি-১৫: ২০১৯ সালে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতসমূহ কর্তৃক দুর্নীতির মামলাগুলো নিষ্পত্তি ও শাস্তি প্রদানের পরিসংখ্যান

বিবরণ		সংখ্যা		
		দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
ঢাকা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১৩১	২৪	১৫৫
	শাস্তিপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	৮৬	১৩	৯৯
ঢাকার বাইরে	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১৫১	১১	১৬২
	শাস্তিপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	৯১	০১	৯২

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ২০১৯ সালে ১৫৫টি দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তি করেছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর মধ্যে দুদক-এর দায়েরকৃত মামলা প্রায় ৮৫% এবং বাকিগুলো (প্রায় ১৫%) বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলা। একই সময়ে ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতগুলো ১৬২টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। এর মধ্যে, বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ১১টি। সারণি-১৫ এ ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালত কর্তৃক দুর্নীতির মামলায় শাস্তি প্রদানের হারের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-১৪: ২০১৯ সালে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালত কর্তৃক দুর্নীতির মামলায় শাস্তি প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

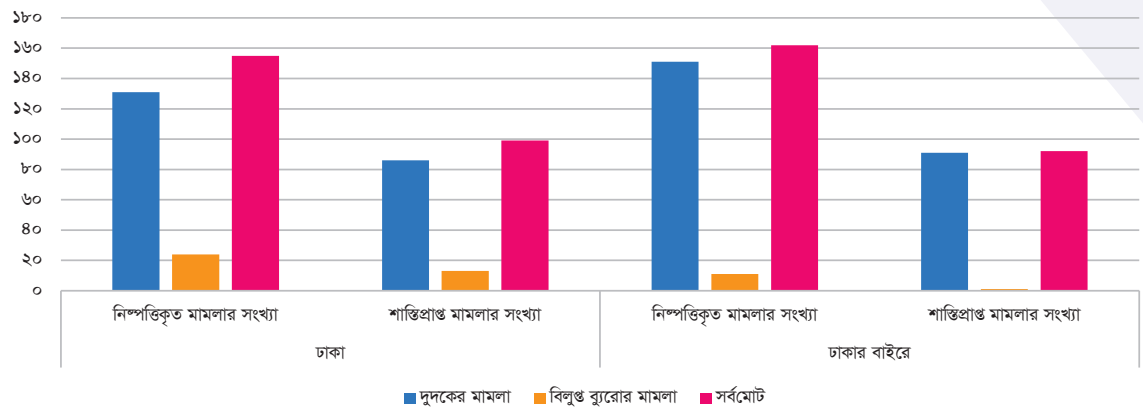

বিচার্য অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

সারণি-১৬: ২০১৯ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৪০	-	৪০
শাস্তি হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা	২৩	-	২৩
খালাসপ্রাপ্ত হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা	১৭	-	১৭

২০১৯ সালে দেশের বিভিন্ন বিশেষ জজ আদালতে অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত ৪০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে, তার মধ্যে ২৩টি মামলায় সাজা এবং ১৭টি মামলায় অভিযুক্তগণ খালাস পেয়েছেন। এই পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কমিশনের দায়েরকৃত অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলায় সাজার হার প্রায় ৫৮% । পক্ষান্তরে ৪২% মামলায় আসামিরা খালাস পেয়েছিল।

চিত্র-১৫: বিচার্য অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলার রায়ের চিত্র

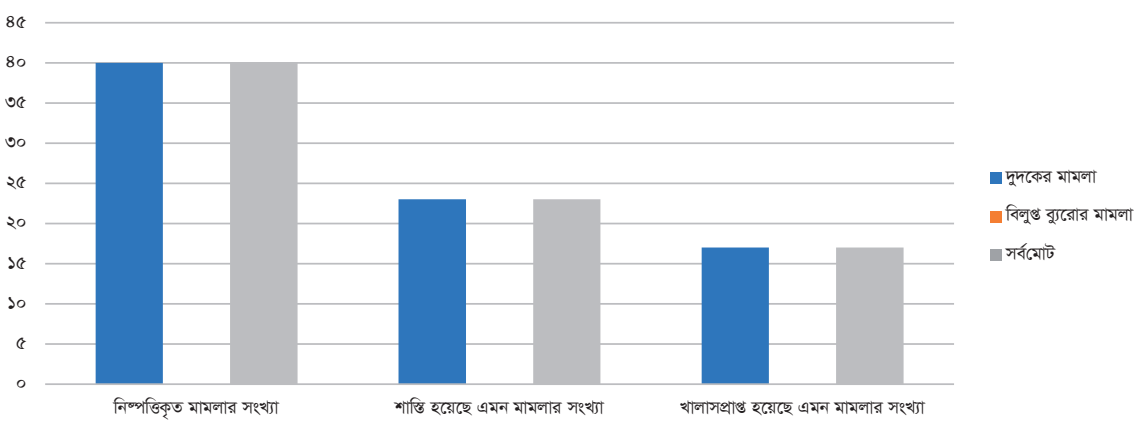

বিচার্য মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

সারণি-১৭: ২০১৯ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১১	-	১১
দণ্ডপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	১১	-	১১
খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা		-	

২০১৯ সালে বিশেষ জজআদালতে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত ১১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং প্রতিটি মামলায় আসামিদের সাজা হয়েছে।

সারণি-১৭ এর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলায় শতভাগ সাজা হয়েছে। ২০১৮ সালেও কমিশনের মানিলন্ডারিং মামলায় সাজার হার শতভাগ ছিল। ধারাবাহিকভাবে মানিলন্ডারিং মামলায় শতভাগ শাস্তি নিশ্চিত করা দুদকের জন্য অবশ্যই গর্বের। দুদক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মানিলন্ডারিং মামলায় নিখুঁত তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে তা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারায় এ সাফল্য এসেছে।

চিত্র-১৬: ২০১৯ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলা সাজা-খালাসের তুলনামূলক চিত্র

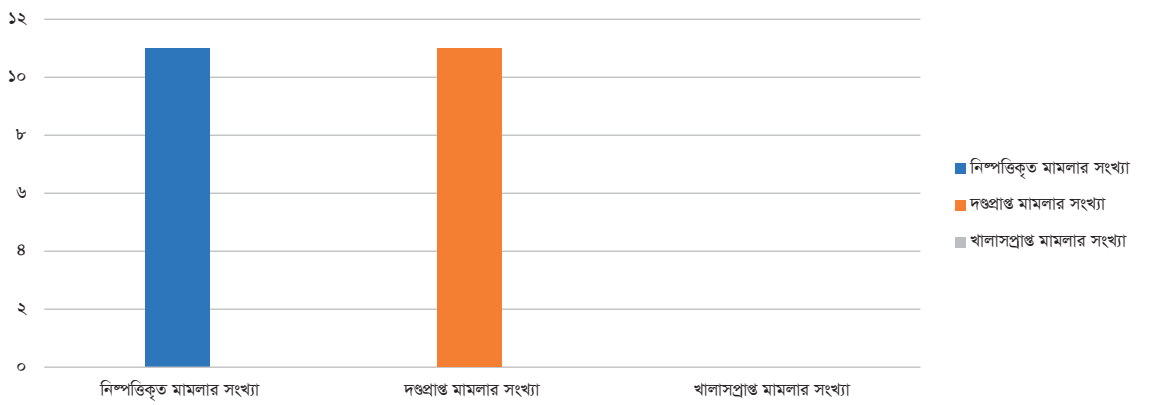

সারণি-১৮: ২০১৯ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য ফাঁদ মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	০৮	০১	০৯
দণ্ডপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	০২	০১	০৩
খালাসপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	০৬	-	০৬

২০১৯ সালে বিশেষ জজ আদালতে ফাঁদ সংক্রান্ত মোট ০৯ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। সারণি-১৮ এর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত ফাঁদ সংক্রান্ত মামলায় ৩৩% ভাগ সাজা হয়েছে।

চিত্র-১৭: বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য ফাঁদ সংক্রান্ত মামলার সাজা ও খালাসের চিত্র

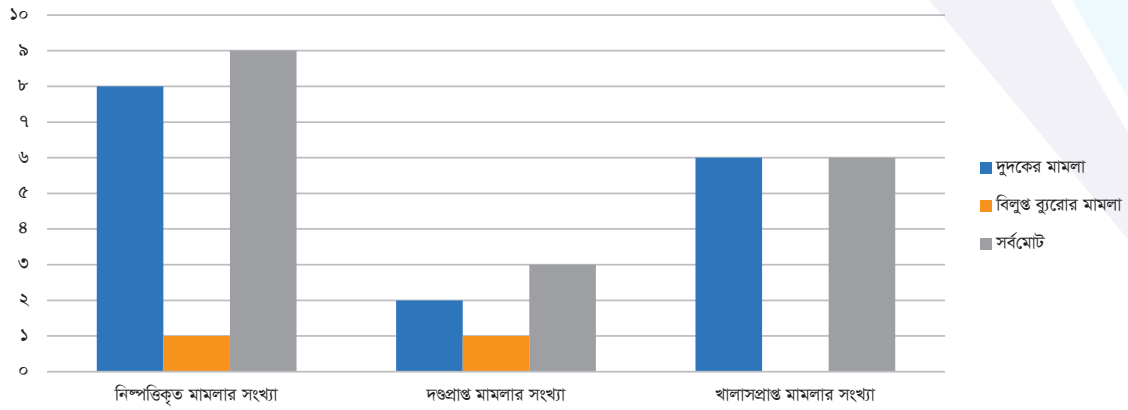

সারণি-১৯: ২০১৯ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় সাজা, অর্থ জরিমানা ও বাজেয়াপ্তকরণ সংক্রান্ত তথ্য

	সাজাকৃত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	জরিমানা (টাকা)	বাজেয়াপ্ত (টাকা)
ঢাকা	৯৯	২৫০	৩৪৭৬,৯৪,০৬,০৬৯	৪৩৩,৯০,৮০,৬০৫
ঢাকার বাইরে	৯২	১২৪	২০,১২,৭৮,৬৯০	২,৯৮,১৪,৭৬৯
সর্বমোট	১৯১	৩৭৪	৩৪৯৭,০৬,৮৪,৭৫৯	৪৩৬,৮৮,৯৫,৩৭৪

সারণি-১৯ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১৯ সালে দুদকের করা মামলায় বিজ্ঞ আদালত ৩,৪৯৭ কোটি ০৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭৫৯ টাকা জরিমানা এবং ৪৩৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩৭৪ টাকা টাকা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করেছে।

সারণি-২০: ২০১৮ ও ২০১৯ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় অর্থ জরিমানা ও বাজেয়াপ্তকরণ সংক্রান্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সাল	জরিমানা (টাকা)	বাজেয়াপ্ত (টাকা)
২০১৮	১৩৯,৯৪,৭৬,৯৯১	১৩,৩৪,৪৭,২৫২
২০১৯	৩৪৯৭,০৬,৮৪,৭৫৯	৪৩৬,৮৮,৯৫,৩৭৪

কমিশন ইতোমধ্যে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করেছে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে এসব সম্পদ ব্যবস্থাপনা করতে চায় কমিশন।

সারণি-২১: সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দুদকের আরো সাফল্য

অবস্থান	সাল	ক্রোককৃত সম্পদ	অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
দেশ	২০১৯	২৮৭৬ শতাংশ জমি ১৩টি বাড়ি ১৯টি ফ্ল্যাট ০৬টি দোকান ০৬টি গাড়ি	৫২২,৯৩,১২,৩২৪.০০ টাকা ৫,৩০০ মার্কিন ডলার ২,২১,৬৫৫টি শেয়ার
বিদেশ	২০১৯	০২টি কমার্শিয়াল স্পেস (দুবাই)	৫৯,৩৪১.৯৩ ব্রিটিশ পাউন্ড ২২,৮১,১৯০ রিংগিত

সারণি-২১ পর্যালোচনা করলে বলা যায়, কমিশন শুধু দেশে নয়, বিদেশেও অবৈধ সম্পদ পাচারকারীদের তাড়া করছে। কেউ যেন অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে না পারে সে বিষয়ে দুদক তার আইনি দায়িত্ব পালন করছে।

১.৫.৩ উচ্চতর আদালতে মামলা পরিচালনা

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে দুদক-এর পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য কমিশন ২৯ জন আইনজীবীকে নিযুক্ত করেছে। তাদের মধ্যে ০৪ জন নারী আইনজীবী রয়েছেন। মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্য ০১ জন আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট সেল-এ দায়িত্ব পালন করছেন।

সারণি-২২ ও ২৩-এ সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন দুদক-এর মামলাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-২২: সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি/রিট/আপিল মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০১৯			২০১৯ সালে নিষ্পত্তি	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০১৯ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০১৯ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি বিবিধ মামলার সংখ্যা	৮০০	৭৮০	১৫৮০	৯৩৭	৮৬	৪০	১২৬	৩০	৯৬
রিট আবেদনের সংখ্যা	৪৭৬	১১৩	৫৮৯	১৪৪	১৬৪	২৫	১৮৯	১৩	১৭৬
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	৩৬৫	১৭১	৫৩৬	৫৯	০৯	০০	০৯	০০	০৯
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা মামলার সংখ্যা	১২৯	১৭২	৩০১	১৪৮	২৩	০০	২৩	০০	২৩

সারণি-২৩: সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ফৌজদারি আপিল/বিবিধ/রিভিশন/রিট হতে উদ্ভূত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০১৯			বর্তমানে পেন্ডিং	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০১৯ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০১৯ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	২০১	৮১	২৮২	২০৯	২৬	০৩	২৯	০৬	২৩
রিট আবেদনের সংখ্যা	৯৭	৩৫	১৩২	১০০	২৯	০২	৩১	০৭	২৪
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	৪০	২৭	৬৭	৫৫	১৬	০০	১৬	০৩	১৩
ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা মামলার সংখ্যা	২৬	৩১	৫৭	৪৬	০২	০০	০২	০১	০১

১.৬ গ্রেফতার সংক্রান্ত

১.৬.১ গ্রেফতারের আইনি ভিত্তি

মামলার আসামিদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসার জন্যই দুদক আসামিদের গ্রেফতার করে। এটি একটি আইনি প্রক্রিয়া মাত্র। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (সংশোধনী ২০১৬) এর ২০(৩) ধারা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২০০৪ সালের দুদক আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্ত বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। ২০১৯ সালে কমিশনের সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় ১২৩ জন আসামিকে অনুসন্ধান/তদন্তের স্বার্থে গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের সকল প্রকার আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। কমিশন কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা, আইনের প্রতি আসামিদের অবজ্ঞা, দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা এবং দুর্নীতির তীব্রতা কমাতেই গ্রেফতার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া কমিশন ঘুষ গ্রহণের আগাম সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় ২০১৯ সালে ঘুষ গ্রহণকালে হাতে-নাতে ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ১৬টি ঘটনায় আসামিদের গ্রেফতার করেছে। দুর্নীতির উৎসমূলে আঘাত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে ঘুষগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষের অর্থসহ হাতে-নাতে গ্রেফতার করা। ঘুষের এই অপসংস্কৃতি প্রতিরোধেই ফাঁদ মামলা পরিচালনা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

সারণি-২৪: গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ব্যাংক কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের পরিসংখ্যান

গ্রেফতারকৃতদের পেশা/পরিচিতি	সংখ্যা
ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারী	২০
সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী	৮৪
জনপ্রতিনিধি	০৩
নন-ব্যাংকিং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী	০১
ব্যবসায়ী ও অন্যান্য	১৫
মোট	১২৩

সারণি-২৪ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যাংক কর্মকর্তার সংখ্যা বেশি রয়েছে। কারণ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা/ব্যাংক কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিষয়ে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে কমিশন ৫৭ জন আসামি গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছিল, পক্ষান্তরে ২০১৯ সালে গ্রেফতার করা হয়েছে ১২৩ জন যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১১৬ শতাংশ বেশি ।

চিত্র-১৮: গ্রেফতারকৃত ব্যাংক কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের পরিসংখ্যান

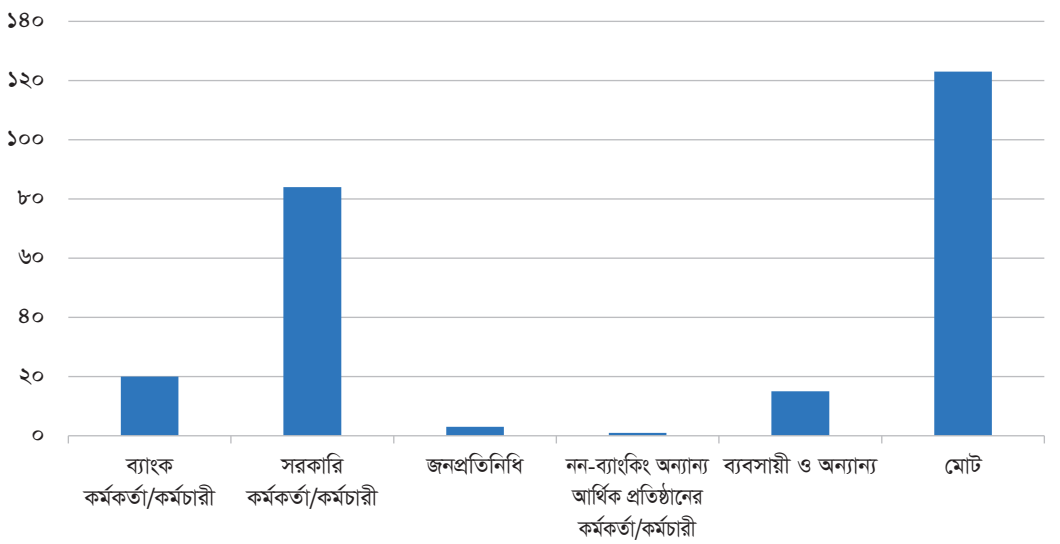

২য় অধ্যায়

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক অভিযান

২.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক অভিযান

২.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান

দুর্নীতির সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ২৭ জুলাই দুর্নীতি দমন কমিশন অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬ চালু করে। কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হটলাইনটি চালু হওয়ার প্রথম সপ্তাহেই প্রায় ৭৫ হাজার ফোনকল আসায় দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬ নিয়ে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে ব্যাপক সংবাদ প্রচার পায়। ফ্রান্স ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা এএফপি, ফ্রান্স ২৪ নিউজ, যুক্তরাজ্যের বিবিসি, দ্য মেইল অনলাইন ইউকে, জার্মানির ডয়েচে ভেলে, কাতার পোস্ট, দ্য হেরাল্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ এ অভিযোগ জানানোর এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৭ সালের ২৭ জুলাই থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬-এ ফোন কল এসেছে প্রায় ৪০ লক্ষ। প্রতিটি কার্যদিবসে গড়ে ফোনকল এসেছে প্রায় ৬৫০০ এর মতো। কমিশনের প্রশিক্ষিত পাঁচজন কর্মকর্তা পালাক্রমে প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে এসব ফোনকল রিসিভ করছেন। কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের সকল কার্যক্রম ডিজিটালি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত অভিযোগ কেন্দ্রটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

অভিযোগকারী নাগরিকগণ দুদক আইনের তফসিলভুক্ত দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলবহির্ভূত অভিযোগ যেমন ব্যক্তিগত বিরোধ, যৌতুক, বিদ্যালয়ে পাঠদানে গাফিলতি, পারিবারিক বিরোধ, পারিবারিক জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ, সামাজিক সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ করে থাকেন। কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে এই কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণ দুদক আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট অভিযোগসমূহ যেমন লিপিবদ্ধ করছেন, তেমনি তফসিল বহির্ভূত অপরাধের বিষয়ে অভিযোগকারীর করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করছেন। সার্বিক বিবেচনায় সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর একটি প্লাটফরম হিসেবে কাজ করছে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬। অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ এর কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে কমিশনের অভিপ্রায় অনুসারে সরকার ২০১৮ সালে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে ২৬ জনের একটি এনফোর্সমেন্ট ইউনিট অনুমোদন করে। ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ সালে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে এই ইউনিট আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। কমিশন এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করে ইউনিটের কার্যক্রমকে কাঠামোবদ্ধ ও আইনগতভাবে পরিচালনা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে। এনফোর্সমেন্ট ইউনিট দুদক হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে পরিপত্র অনুযায়ী অভিযান পরিচালনা, টেলিফোনিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পাশাপাশি অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়।

২০১৯ এ দুদক হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন ১০০১ টি অভিযান পরিচালনা করে। তাৎক্ষণিক এসব অভিযানের মাধ্যমে অসংখ্য দুর্নীতির ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিতর্কিত নিয়োগ বন্ধ করা, নিম্নমানের নির্মাণ কাজ বন্ধ করা, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, নদী-খাল ও সড়কের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদকরণ, পরিবেশ রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব অভিযোগ থেকে সকল আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ৭টি ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে ঘুষের টাকাসহ অপরাধীদের গ্রেফতার করে আইন আমলে আনা হয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে পাওয়া প্রাথমিক তথ্যের সত্যতা থাকায় ১২৬টি অভিযোগের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট অভিযানের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের সর্বশেষ সংশোধিত বিধি ১০(চ)-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরাসরি ১১ টি মামলা রুজু করা হয়েছে।

অভিযান পরিচালনায় কেন্দ্রীয়ভাবে যেমন কমিশনের সশস্ত্র পুলিশ ইউনিটকে ব্যবহার করা হচ্ছে, পাশাপাশি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতাও নেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ অভিযানই সফল হয়েছে। পুলিশসহ প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা প্রশংসনীয়।

স্থানীয় সরকার ও নাগরিক সেবা, ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, বন ও পরিবেশ, ইউটিলিটি সেবা, প্রকৌশল, কৃষি, অর্থসহ প্রায় প্রতিটি সেক্টরেই এসব অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব অভিযানে সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনও পাওয়া যাচ্ছে। কমিশনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে (www.facebook.com/acc.org.bd) অভিযানের তথ্য প্রকাশের ফলে বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন কমিশনকে প্রশংসা করছেন, আবার কেউ কেউ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার অনুরোধ জানাচ্ছেন, সংখ্যায় কম হলেও কেউ কেউ সমালোচনাও করছেন।

সারণি-২৫: এক নজরে ২০১৯ সালে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ লিপিবদ্ধকৃত মোট অভিযোগ	দুদক কর্তৃক পরিচালিত এনফোর্সমোন্ট অভিযান	বিভিন্ন দপ্তরে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের সংখ্যা	ফাঁদ মামলা	এনফোর্সমেন্ট টিমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা	এনফোর্সমেন্ট টিমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিচালিত অনুসন্ধান সংখ্যা
৪,৭৬০	১০০১	৯৫৩	০৭	১১	১২৬

চিত্র-১৯: খাতভিত্তিক ২০১৯ সালের এনফোর্সমেন্ট চিত্র

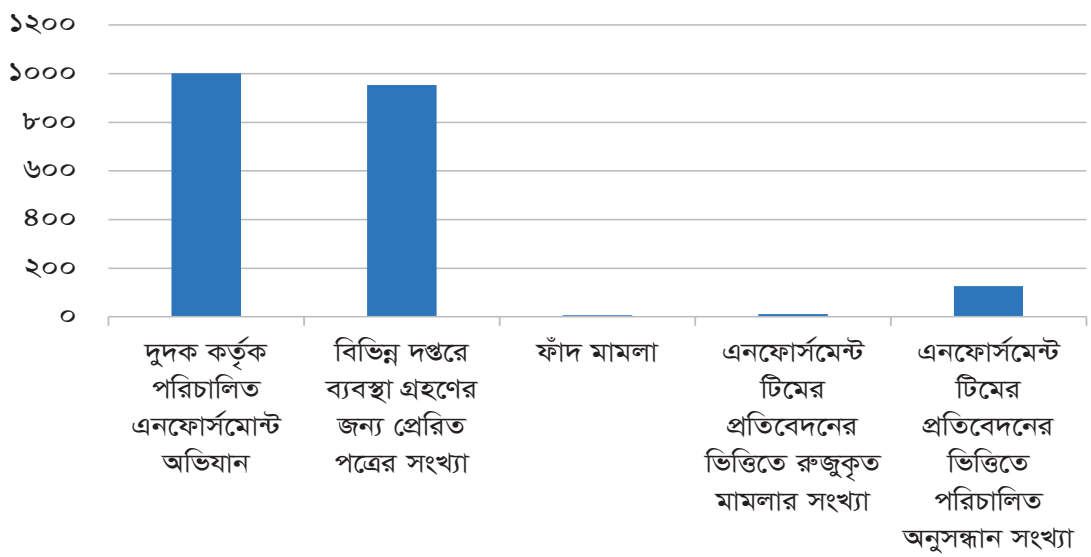

তৃণমূল থেকে নগর পর্যায়ের প্রতিটি স্তরেই সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে সাধারণ মানুষের অনেক অভিযোগ-অনুযোগ শোনা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের শৈথিল্য, অজ্ঞতা, অনিয়ম-দুর্নীতি, সেবা প্রার্থীদের অজ্ঞতা থাকার কারণেও সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে জটিলতা হচ্ছে। সরকারি পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমও নেই। যে কারণে দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানির ঘটনা ঘটছে। কমিশন এসব অভিযানের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কাজ করছে। কমিশনের এসব কার্যক্রমের প্রতি মানুষের আস্থা রয়েছে বলে মনে করার অনেক যৌক্তিক কারণ রয়েছে। কারণ আস্থা না থাকলে কমিশনের অভিযোগকেন্দ্রের হটলাইনে এত অধিকসংখ্যক ফোনকল আসত না। এসব অভিযানের কারণে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হচ্ছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তেমনি নাগরিকগণ তাদের অধিকার নিয়ে উচ্চকিত হচ্ছে, সরকারি কর্মকর্তাগণও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

৩য় অধ্যায়

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ

৩.১ ভূমিকা

৩.২ দুর্নীতি বিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ

৩.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাহ্যিকভাবে অনুধাবন করা না গেলেও কমিশন নিজস্ব কর্মকৌশলের আলোকে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপকে লক্ষ্য রেখে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি ঘটার আগেই প্রতিরোধমূলক আগাম অভিযানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা। মধ্যমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গণশুনানিসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম। মূলত এসবের মাধ্যমে সর্বস্তরের পরিণত মানুষকে দুর্নীতি বিরুদ্ধে সচেতন করা হচ্ছে। সততা সংঘের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম যেমন বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশের তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিশনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে এই তরুণ প্রজন্ম। তরুণ প্রজন্মের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ করার কৌশল গ্রহণ করেছে। কারণ তরুণরাই আগামী দিনের বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। তাদের মননে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, কর্মস্পৃহা জাগিয়ে তোলা গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তা হবে টেকসই উদ্যোগ। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের টার্গেট গ্রুপও তরুণরাই। এই কৌশলের অংশ হিসেবেই দেশের ২৬ হাজার ২১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের নৈতিকমূল্যবোধ বিকাশে বিতর্ক প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে। কমিশন এই কর্মপ্রক্রিয়ায় সরকারি-বেসরকারি, (জিও-এনজিও) সকলকে সম্পৃক্ত করেছে। স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন, শিক্ষা বিভাগ, তথ্য বিভাগকে যেমন এসব কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তেমনি অক্সফামের মতো এনজিওকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে। জিও-এনজিওর সমন্বয়ে কমিশনের এসব কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশীদারিত্বের দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। দুর্নীতি, বৈষম্য, মাদক, সন্ত্রাসের মতো নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে তরুণরা যাতে সম্পৃক্ত না হয়, জীবনের পথপরিক্রমায় কোনটি শুদ্ধ বা কোনটি ভুল তা নির্ণয় করার সক্ষমতা যাতে তারা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যেই শিক্ষার পাশাপাশি দুদকের এ প্রয়াস। কমিশনের এ কার্যক্রমের নিবিড় তদারকি করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই হচ্ছে দুর্নীতি প্রতিরোধে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার । 'প্রতিরোধ প্রতিষেধকের চেয়ে উত্তম' এই উক্তির প্রতিফলন ঘটেছে দুদক আইনে। সে কারণেই হয়তো দুদক আইন, ২০০৪-এ কমিশনকে যে ১১টি কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ৬টি কার্যক্রমই দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক। এসব কার্যের মধ্যে একটি রয়েছে 'দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।' কমিশন এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই সমাজের সকল স্তরের মানুষকে দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর যেসব দেশ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে, সেসব দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সমাজ যখন দুর্নীতিপরায়ণদের প্রত্যাখ্যান করবে, তখন দুর্নীতি করার সুযোগ কমে আসবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না তেমন কোনো মৌলিক গবেষণালব্ধ তথ্য কমিশনের হাতে নেই, তবে কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিযোগ, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পাওয়া তথ্য, কমিশনে মানুষের লিখিত অভিযোগ- এসব তথ্য বিশ্লেষণ করলে মোটামুটিভাবে বলা যায়, দুর্নীতি বিরোধী গণসচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কাজে দুদকের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, গণমাধ্যমও যথার্থ ভূমিকা রাখছে। মানুষও তার অধিকার নিয়ে কথা বলছে। এমনকি সন্তান পিতার আয়ের উৎস জানতে চাচ্ছেন-এমন একাধিক ঘটনা কমিশন অবহিত হয়েছে। সব মিলিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমন্বিত ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্মকৌশল প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে হবে।

৩.১.১ গবেষণা, পরিবীক্ষণ, প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন দ্বারা সৃষ্ট একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার ভিত্তিতে যেভাবে মামলা দায়ের ও পরিচালনার আইনি ম্যান্ডেট রয়েছে, ঠিক একই প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করারও আইনি ম্যান্ডেট কমিশনের রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭ ধারায় কমিশনের কার্যাবলির বিবরণ রয়েছে। কমিশনের দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম এই সব ধারা অনুসরণ করেই সম্পাদন করা হয়। দুদক আইন, ২০০৪ এর ১৭(চ) ধারায় বলা হয়েছে "দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা"। আবার একই আইনের ১৭(ছ) ধারায় বলা হয়েছে "দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।" ১৭(ট) ধারায় বলা হয়েছে, 'দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।'

তাই দুর্নীতি বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি, কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ কৌশল উদ্ভাবনে গবেষণা, অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করা, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জিও-এনজিওর সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগের মাধ্যমেই প্রতিরোধমূলক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

একজন মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালিত এই অনুবিভাগটি কমিশনের সকল প্রকার আউটরিচ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড, সততা স্টোর, সততা সংঘ, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে এই অনুবিভাগটি ফোকালপয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

৩.২ দুর্নীতি বিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি

৩.২.১ সমাজশক্তির অংশগ্রহণমূলক দুর্নীতি প্রতিরোধ আন্দোলন

কেবল আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলন দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সামাজিক ব্যবস্থাপনাটাই এমন হবে, যাতে দুর্নীতি করার চিন্তাও কেউ করতে না পারে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সামাজিক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। বিচ্ছিন্নভাবে দেশের কোথাও কোথাও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হচ্ছে না তা কিন্তু নয়। তবে এ আন্দোলনের সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ হয়তো ঘটেনি। দুর্নীতি দমন কমিশনে যেসব অভিযোগ আসে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ অভিযোগই আসে নিজ নিজ সহকর্মীর মাধ্যমে অথবা আত্মীয়স্বজন কিংবা প্রতিবেশী অথবা পরিবারের নিকটতম সদস্যদের নিকট থেকে। যে কারণেই দুর্নীতিপরায়ণদের অনেক গোপনীয় তথ্য দুদকে চলে আসে। এ থেকে অনুধাবন করা যায় এদেশের সমাজ ব্যবস্থা এখনও দুর্নীতিকে ন্যূনতম প্রশ্রয় দিতে চায় না। দুর্নীতি এবং দুর্নীতিপরায়ণদের বিরুদ্ধে মানুষ ক্রমাগত সচেতন হচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশন সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে দুর্নীতি বিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চায়।

দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন কমিশন সকলের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্নীতি প্রতিরোধ কৌশল বাস্তবায়নে কাজ করছে। এই কর্মপ্রক্রিয়ায় কমিশন প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে চায়। ঠিক এ কারণেই কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, এনজিও, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার্থী-শিক্ষক, পেশাজীবীসহ সকলকে একই প্লাটফর্মে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কমিশনের পাঁচ বছর মেয়াদি যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, সেখানে দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। সমাজে সততা ও শুদ্ধাচারের বিকাশে সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। কমিশন আশান্বিত, কারণ দেশের সরকার, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, এনজিও, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার্থী-শিক্ষক, পেশাজীবীসহ প্রায় সকলেই দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশনের কার্যক্রমকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিচ্ছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৭ ধারায় বর্ণিত দুদকের ১১টি কার্যক্রমের মধ্যে ছয়টিই দুর্নীতি প্রতিরোধের আওতাভুক্ত। প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যেই কমিশন দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও মহানগরগুলোতে সমাজের আলোকিত মানুষদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে এবং এসকল কমিটির মাধ্যমে আচরণগত উৎকর্ষ তথা উত্তম চর্চার বিকাশে গণসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনেক সচেতন হয়েছেন। সাধারণ মানুষ দুর্নীতি এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করছেন।

২০১৬ সালে সংশোধিত মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থা গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা অনুযায়ী অনধিক ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে জেলা ও মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং অনধিক ৯ সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি যেখানে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য রাখা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি এবং একজন সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হবেন। কমিটির সকল সদস্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং কমিশনের নিকট সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়/সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দায়বদ্ধ থাকবেন। কমিটির জন্য নির্ধারিত এলাকায় বসবাসকারী পূর্ণবয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিকগণই কেবল কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ার যোগ্য হবেন। বিদেশি কোনো নাগরিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী, কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য, আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বা দেউলিয়া ঘোষিত, ঋণ খেলাপি, কোনো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত অথবা আদালত কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিগণ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। মূলত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিগুলো স্বেচ্ছাব্রতী, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা, ধর্মীয় নেতা ও প্রজাতন্ত্রের সাবেক কর্মকর্তাসহ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন

সৎ ও সক্রিয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত। কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগ অধিশাখা কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের সকল প্রকার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অধিশাখা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ছকে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। কমিটির যে কোনো তিন সদস্যের সমন্বয়ে হিসাব-নিরীক্ষা উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি নির্ধারিত সময়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে কমিটির নিকট নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। কমিশনের উপ-পরিচালক ও তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাগণ যে কোনো কমিটির হিসাব পরিদর্শন করতে পারেন। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এই নীতিমালার আলোকেই দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২০১৯ সালে দুদক ০১টি মহানগর, ০৮টি আঞ্চলিক মহানগর, ৬২টি জেলা ও ৪২৯টি উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিভাগ-ভিত্তিক এসব উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সংখ্যা তালিকা সারণি-২৬-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি-২৬: বিভাগ-ভিত্তিক উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সংখ্যা

বিভাগের নাম	উপজেলা দুপ্রক	জেলা দুপ্রক	মহানগর দুপ্রক
ঢাকা	৭৪	১৩	০৮
চট্টগ্রাম	৯১	১০	০১
রাজশাহী	৬০	০৮	-
খুলনা	৫০	১০	-
বরিশাল	৩৫	০৬	-
সিলেট	৩৬	০৪	-
রংপুর	৫০	০৮	
ময়মনসিংহ	৩৩	০৩	
সর্বমোট=	**৪২৯**	**৬২**	**০৯**

চিত্র-২০: বিভাগ-ভিত্তিক দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি

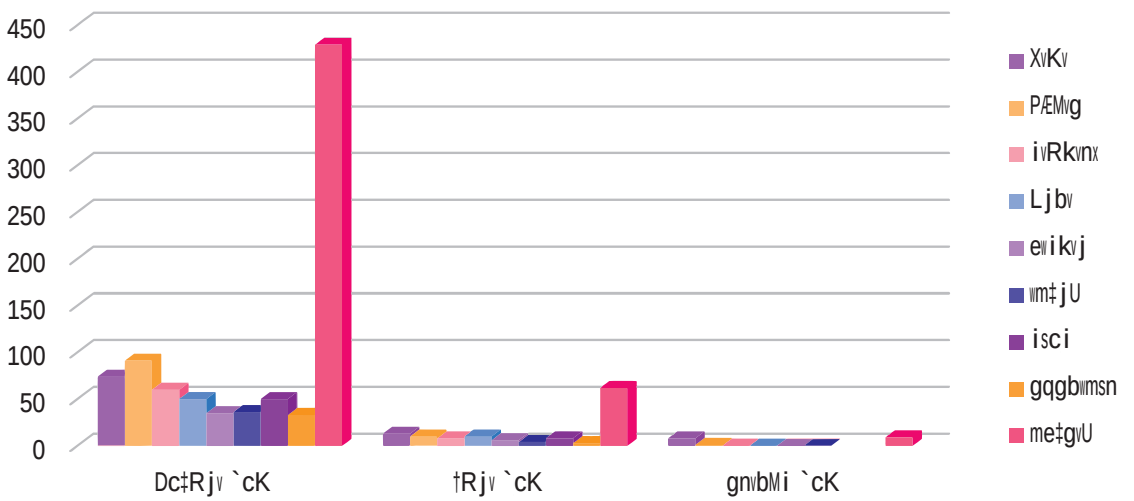

৩.২.২ 'সততা সংঘ'-তরুণদের দুর্নীতি বিরোধী মঞ্চ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়নের একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা। টেকসই উন্নয়নের সবকিছুই ভবিষ্যৎ নিয়ে আবর্তিত। সঙ্গত কারণেই নতুন প্রজন্ম হবে এর কেন্দ্রবিন্দু। তারাই হবে এই উন্নয়নের প্রধান উপকারভোগী। তাই দেশের তরুণ প্রজন্মকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তথা নৈতিকতার উৎকর্ষে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে দুদক বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশনের আউটরিচ কার্যক্রমের সিংহভাগ অর্থ ব্যয় করা হয় তরুণদের উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং কার্যকর পরিবীক্ষণের মাধ্যমেই এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

নতুন প্রজন্মই আগামীতে দেশের নেতৃত্ব দিবে। তাই সৎ এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্ম সৃষ্টি করা গেলেই দুর্নীতিসহ সকল প্রকার অনৈতিকতার লাগাম টেনে ধরা সহজ হবে। এই উদ্দেশ্যেই কমিশন দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সততা সংঘ গঠন করছে। সততা সংঘ হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, মূল্যবোধকে গ্রোথিত করার মানসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। আগামী দিনে দেশের নেতৃত্ব দিবে আজকের তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা। তাই তাদের নৈতিকতা ও সততা হতে হবে সমাজের কালোত্তীর্ণ নীতি ও প্রথার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। দুর্নীতি দমন কমিশন 'সততাই সর্বোত্তম নীতি' এই আদর্শে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। কারণ দুর্নীতি আমাদের সততা ও নৈতিকমূল্যবোধের অতীত ঐতিহ্যের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নিষ্ঠাবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করা; জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা; দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে স্ব-স্ব কর্ম এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'সততা সংঘ' (Integrity Unit) গড়ে তুলেছে কমিশন। সততা সংঘের গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা-২০১৫ অনুসারে 'সততা সংঘ' এর সদস্যরা হবে সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবী, সকল প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবমুক্ত এবং আইনের বিধানাবলির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো কার্যক্রমে জড়িত হবে না। প্রতিটি সততা সংঘ-এ একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১১ (এগারো) জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের সমন্বয়ে পরামর্শক কাউন্সিল (Advisory Council) গঠন করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী সাধারণ সদস্য হবেন। পরামর্শক কাউন্সিলের সাথে পরামর্শক্রমে মহানগর/জেলা/উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিটি 'সততা সংঘের' কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য, সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত করেন।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিটি 'সততা সংঘ' শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জলবায়ু ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ সকল প্রকার জনহিতকর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। এ ক্ষেত্রে কমিশন সীমিত সামর্থ্যের মাধ্যমে সততা সংঘের সদস্যদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন ও দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, মানববন্ধন, পদযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, কার্টুন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনসহ বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

কমিশন বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্লস গাইডস অ্যাসোসিয়েশন এর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে তাদের সাথে যৌথভাবে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে দুর্নীতি বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে বাংলাদেশ গার্লস গাইডস অ্যাসোসিয়েশন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুপ্রেরণায় গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'সততা সংঘ' এর সদস্যদের নৈতিকতা, দুর্নীতিবিরোধী যোগাযোগ কৌশল, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য অধিকার আইন, জেন্ডার উন্নয়ন, মানবাধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন ও সুশাসন ইত্যাদি ইস্যুতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কাইটস, বাংলাদেশ নামক একটি এনজিও নির্মিত 'সততা সংঘ অনলাইন কোর্স' নামক একটি কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশব্যাপী ২৬ হাজার ২১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২০ সালে যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে অক্সফাম ইন বাংলাদেশ নামক আন্তর্জাতিক এনজিওর কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান করেছে।

সারণি-২৭: বিভাগ-ভিত্তিক সততা সংঘের পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	সততা সংঘের সংখ্যা
ঢাকা	৪,৫১৮
চট্টগ্রাম	৩,৩৯৪
রাজশাহী	৪,২৬৪
খুলনা	৪,২২০
বরিশাল	২,৮২৮
সিলেট	১,২৮৫
রংপুর	৪,০০২
ময়মনসিংহ	১,৮৪৫
সর্বমোট =	**২৬,৩৫৬ টি**

চিত্র-২১: বিভাগ-ভিত্তিক সততা সংঘের পরিসংখ্যান

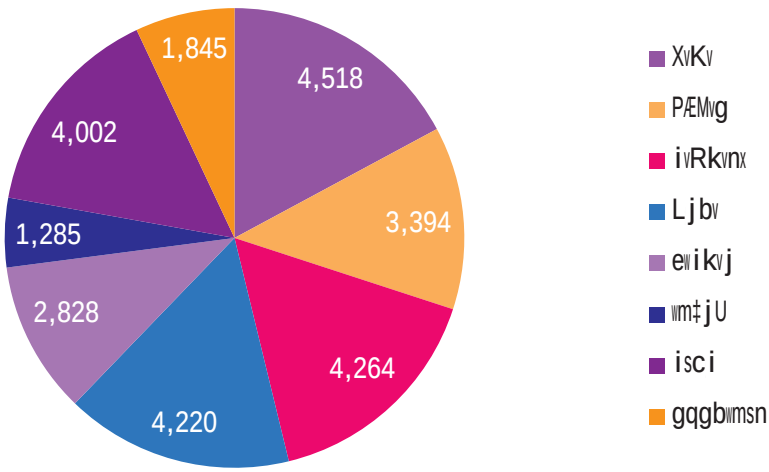

৩.২.৩ উত্তম চর্চার বিকাশে দুদকের নতুন সংযোজন 'সততা স্টোর'

তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততার ব্যবহারিক চর্চার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে কমিশন ২০১৬ সাল থেকে তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে *সততা স্টোর* গঠনের উদ্যোগ নেয়। ২০১৭ সালে কমিশন 'সততা স্টোর' গঠন সংক্রান্ত নীতিমালার অনুমোদন দেয়। কেবল ২০১৯ সালেই কমিশন ২,১৭৭টি সততা স্টোর স্থাপন করেছে। কমিশন বিশ্বাস করে সততা ও নৈতিকতা প্রাত্যহিক জীবনে নিবিড় চর্চার বিষয়। পরিশুদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে সততা চর্চার কোনো বিকল্প নেই। তরুণরা অনুকরণ প্রিয় হয়। তাদের মননে একবার কোনটি ঠিক কিংবা ভুল তা নির্ধারিত হলে, যথাযত অবস্থান নিতে তারা ভুল করবে না। দুদক এই উদ্দেশ্যে তরুণ প্রজন্মের মাঝে সততা ও নৈতিকতাকে শাণিত করার জন্য বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশনের এই কার্যক্রমের নতুন সংযোজন হচ্ছে 'সততা স্টোর'। অভিনব এই স্টোর বা দোকান স্থাপন করা হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এসব দোকানে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের পাশাপাশি রয়েছে বিস্কুট, চিপস , চকোলেট ইত্যাদি। প্রতিটি পণ্যের মূল্য তালিকা, পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য ক্যাশ বাক্স ইত্যাদি রয়েছে-নেই শুধু বিক্রেতা। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে ক্যাশ বাক্সে পণ্য মূল্য পরিশোধ করছে। কমিশনের নিকট এখন পর্যন্ত এ সকল স্টোর পরিচালনার ক্ষেত্রে অনৈতিকতার কোনো অভিযোগ আসেনি। এই স্বচ্ছতা এবং সততা কমিশনকে আশান্বিত করছে। কমিশনের উদ্যোগ ছাড়াও কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর স্থাপন করছেন।

সারণি-২৮: বিভাগ-ভিত্তিক সততা স্টোরের পরিসংখ্যান

বিভাগের নাম	সততা স্টোরের সংখ্যা
ঢাকা	৫২৬টি
চট্টগ্রাম	৮২২টি
রাজশাহী	৪০১টি
খুলনা	১,২২২টি
বরিশাল	২৬৭টি
সিলেট	২২৩টি
রংপুর	৫১২টি
ময়মনসিংহ	১৭৬টি
সর্বমোট =	**৪,১৪৯টি**

চিত্র-২২: বিভাগ-ভিত্তিক সততা স্টোরের চিত্র

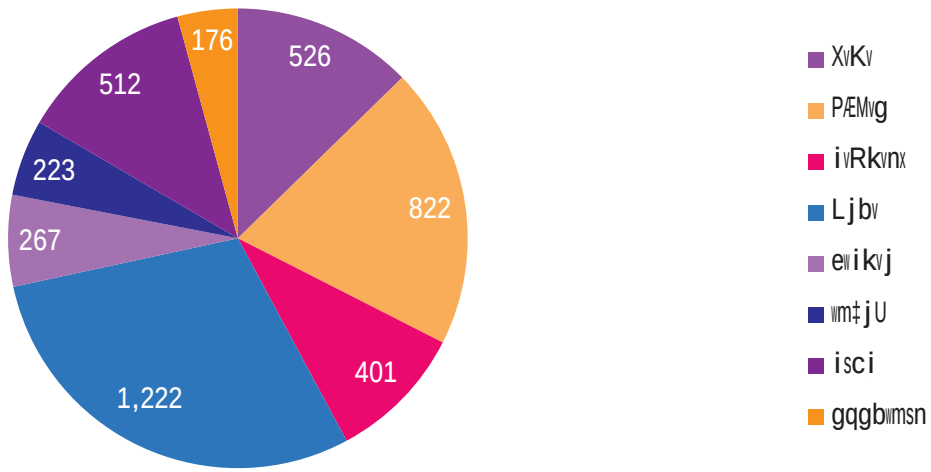

৩.২.৪ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রতিরোধ কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগ সাংবৎসরিক ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, সততা সংঘ, স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা হয়।

সাধারণত নগর/মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন এই চার স্তরে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং এসব কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত সততা সংঘের সদস্যদের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী র‍্যালি, মানববন্ধন, পদযাত্রা, সভা-সেমিনার, কর্মশালা, তথ্যচিত্র, কার্টুন, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহ স্থানীয় নাগরিক সমাজ, সততা সংঘ, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সাথে নিয়ে যেসব দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধন, শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা আয়োজন করে সেসব কর্মসূচিতে বিভিন্ন পেশার সচেতন মানুষ অংশ নিয়ে চলমান দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে থাকেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনকে কমিশন সর্বদা স্বাগত জানায়। প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের অধিকাংশ কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (২১ নভেম্বর), বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালনে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের প্রতিরোধমূলক কর্মসূচিতে কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

উত্তম চর্চার বিকাশে ২০১৯ সালে বিভিন্ন সুবচন সংবলিত ৭,৫৪,১০০টি পোস্টার ও ১৮,২০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ''খারাপ কাজ করবো না-খারাপ কাজ সইবো না'', ''ভালো কাজ করবো-দেশকে সবাই গড়বো'', ''দেশকে নিয়ে ভাববো, নীতির পথে চলবো'', সত্য কথা বলবো অন্যায়-অবিচার রুখবো'', আইন মেনে চলবো-নিরাপদে থাকবো'', ''দেশপ্রেমের শপথ নিন-দুর্নীতি বিদায় দিন'', ''মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না'', ''গুরুজনের সহিত উপহাস করিও না'', ইত্যাদি সুবচন সংবলিত প্রায় ৪২,৬১৪টি খাতা, ৪৭,০৯৭টি স্কেল, ১৭,৪৮৪টি জ্যামিতি বক্স, দেশব্যাপী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ বছরে ছাত্র-শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৪,৯৯১টি ছাতা এবং ৩৫,২৪৬টি স্কুল ব্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির বিভাগওয়ারী কার্যক্রম সারণি-২৯ ও সততা সংঘের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সারণি-৩০-এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি-২৯: ২০১৯ সালে উপজেলা, জেলা ও মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের বিভাগওয়ারী কার্যক্রম

বিভাগের নাম	আলোচনা সভা	বির্তক প্রতিযোগিতা	রচনা প্রতিযোগিতা	মানব বন্ধন	র‍্যালি	সেমিনার	নাটক	বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতা	অন্যান্য
ঢাকা	৬৭৬	১,৬০৮	১,৫৭৪	১৭৫	১৫৮	০৩	১,৫৪০	৪২৬	২৪১
চট্টগ্রাম	২,০৩২	৪,২৮৮	৪,২৯৬	২০২	৬৪	৫২	৯১	১,২৫৭	-
রাজশাহী	৬৪৫	১,৮২১	১,৮৩৩	২১২	১০৮	২৮	৫০	১০৮	২০৩
খুলনা	৫৪৪	৪৪	৩২	৬৯	৫৪	০৪	১০	২৭৩	৪৯০
বরিশাল	১৩৭	২৯	২৯	৪১	-	২৭	০৪	২৭	০৮
সিলেট	১,০৩৬	১,২৬৯	১,২৬৯	৩৫	১৬	০১	-	১১০	১,৮২১
রংপুর	১১৬	১,৩১০	১,৩০৭	৯৩	৯৪	০৩	৩৭	০৫	২০
ময়মনসিংহ	১৮০	৩০	৩০	৭০	৩৫	৩৫	০৫	২৮	২৫
সর্বমোট =	**৫,৩৬৬**	**১০,৩৯৯**	**১০,৩৭০**	**৮৯৭**	**৫২৯**	**১৫৩**	**১,৭৩৭**	**২,২৩৪**	**২,৮০৮**

সারণি-৩০: ২০১৯ সালে সততা সংঘসমূহের কার্যক্রম

বিভাগের নাম	আলোচনা সভা	বির্তক প্রতিযোগিতা	রচনা প্রতিযোগিতা	মানব বন্ধন	র‍্যালি	সেমিনার	নাটক	বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতা	অন্যান্য
ঢাকা	৪৮৯	৪,১৪৪	৪,১৫৭	৯৯	৮৫	০২	২,৭১২	৪০৪	১০৫
চট্টগ্রাম	২,৪০৮	৪,২৮৮	৪,২৯৬	২০২	৬৪	৫১	৯১	২,৭৩২	-
রাজশাহী	৬৪	৩,৮৩৯	৩,৮৫১	১৯৫	১১১	০২	০২	৩২	১১
খুলনা	১,৮২৬	৩,৫৪৯	৩,৫৪৯	২৩	২৮	-	০৭	১,৮২১	১,৯২৫
বরিশাল	১,৮৬৮	২,৭৯১	২,৭৯১	৪১	-	২৭	০৪	১,৮৫৪	২,৭৯১
সিলেট	১,৭৫৩	১,২৬৯	১,২৬৯	১৫	০৭	০১	-	৩০	১,৮৮৪
রংপুর	২,০৩১	৩,৩১৩	৩,৩১০	১৯৮	১৯৯	-	২,০১০	৩০	৩০
ময়মনসিংহ	১,৮২৯	১,৮২৯	১,৮২৯	৩৫	৩৫	৩০	০৫	২০	১৮২৯
সর্বমোট =	**১২,২৬৮**	**২৫,০২২**	**২৫,০৫২**	**৮০৮**	**৫২৯**	**১১৩**	**৪,৮৩১**	**৬,৯২৩**	**৮,৫৭৫**

সারণি-৩১: ২০১৯ সালে উত্তম চর্চার বিকাশে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নম্বর	উপকরণের নাম	সংখ্যা
১	খাতা	৪২,৬১৪টি
২	স্কেল	৪৭,০৯৭টি
৩	জ্যামিতি বক্স	১৭,৪৮৪টি
৪	ছাতা	২৪,৯৯১টি
৫	পোস্টার	৭,৫৪,১০০টি
৬	লিফলেট	১৮,২০০টি
৭	স্কুলব্যাগ ও অন্যান্য	৩৫,২৪৬টি

প্রচারমূলক কার্যক্রম :

- গত বছরের ন্যায় এবারও প্রতিরোধ অনুবিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) সহযোগিতায় মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

- দেশে দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'শাস্তি', 'সত্যের জয়', 'ভালো থাকবো, ভালো রাখবো', 'ভুল', 'সততার জয়' নামক স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্য চিত্রসহ একাধিক টিভিসি বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছে। একইভাবে জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা সদরে জনসমাগম হয় এমন এলাকায় এই চলচ্চিত্রসমূহ নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।

- **দুদক বার্তা :** দুর্নীতি দমন কমিশনের মাসিক প্রকাশনা হচ্ছে দুদক বার্তা। এই প্রকাশনার মাধ্যমে কমিশনের সকল প্রকার কার্যক্রম, যেমন-মামলা দায়ের, চার্জশিট দাখিল, বিচারিক আদালতে মামলার রায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান, গণশুনানিসহ কশিনের পূর্ববর্তী মাসের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। কমিশনের নিজস্ব উদ্যোগে বিনামূল্যে দুদক বার্তা সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। কমিশনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা জনগণকে অবহিত করার জন্যই দুদক বার্তা সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি কমিশনের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজেও দুদক বার্তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

- **দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড :** 'দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড' গণমাধ্যম কর্মীদের নিকট বেশ জনপ্রিয় একটি পুরস্কার। কমিশন প্রতিবছর এ পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের সৃজনশীল প্রতিবেদন তৈরিতে উৎসাহিত করে। দুদক গণমাধ্যমে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানী ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সৃজনশীল প্রতিবেদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করে। প্রতিবছর দুটি ক্যাটাগরিতে মোট ছয়জন সাংবাদিককে পুরস্কৃত করা হয়। দেশের খ্যাতিমান সাংবাদিকদের সমন্বয়ে গঠিত জুরি বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন এ পুরস্কার দিয়ে থাকে। ২০১৯ সালে কমিশন দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানী ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে সৃজনশীল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গণমাধ্যমের (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার) সাংবাদিকদের মধ্যে দুদক কর্তৃক প্রবর্তিত 'দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড' বিজয়ী সাংবাদিককে পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করে।

- **আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস :** কমিশন ২০১৯ সালে দেশব্যাপী জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে আলোচনাসভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ-এর নেতৃত্বে কমিশনের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দুদকের প্যানেল আইনজীবী, ঢাকা মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, গার্লস গাইডস, বয়েজ স্কাউট, সততা সংঘের সদস্য, আনসার, বিএনসিসি, বিভিন্ন এনজিও, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার, মাদক দ্রব্যনিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা জেলা প্রশাসনসহ নগরীর সর্বস্তরের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে শাহবাগ পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে দুর্নীতি বিরোধী মানববন্ধন করেন। অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য এই মানববন্ধনে দুর্নীতি বিরোধী প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন শোভা পায়। শুধু ঢাকা নয় দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় একই সময়ে দুর্নীতি বিরোধী এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

বিশ্বায়নের যুগে কোনো দেশের একক চেষ্টায় বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান করা প্রায় অসম্ভব। দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত দুর্নীতি বিরোধী সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। ইউনাইটেড ন্যাশনস কনভেনশন এগেইন্সট করাপশন-এর সদস্য রাষ্ট্রের দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা হিসেবে কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশীদারিত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনে বিশ্বাসী। কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনের অংশ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ১৪ জুন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে ভুটান দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৮ সালে দুদক ও দি ইনভেস্টিগেটিভ কমিটি অব দি রাশিয়ান ফেডারেশন (আইসিআরএফ) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। একইভাবে ২০১৯ সালে ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে দুদক।

এই সমঝোতা স্মারকে দুর্নীতির প্রাথমিক অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ, প্রমাণীকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ অভিজ্ঞতার বিনিময়, উত্তম চর্চা, দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন বিষয় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশন উত্তম চর্চার বিকাশে ইন্দোনেশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়াসহ প্রায় ১৮টি দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান যেমন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাংলাদেশ স্কাউটস, বাংলাদেশ গার্লস গাইডস অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে দুর্নীতি বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত' কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, তথ্যমেলা, গণশুনানি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, দুর্নীতি বিরোধী মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কার্টুন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, আলোচনাসভা, পথসভা, মানববন্ধন, পদযাত্রা ও দুর্নীতি বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচিতেও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কমিশনকে অনুপ্রাণিত করছে।

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে বাংলাদেশ গার্লস গাইডস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুপ্রেরণায় গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'সততা সংঘ' এর সদস্যদের নৈতিকতা, দুর্নীতিবিরোধী যোগাযোগ কৌশল, তথ্য প্রযুক্তি, তথ্য অধিকার আইন, জেন্ডার উন্নয়ন, মানবাধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন ও সুশাসন ইত্যাদি বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া কাইট, বাংলাদেশ সততা সংঘের সদস্যদের বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সঙ্গে কমিশনের সম্পৃক্ততা

১. জার্মান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা GIZ-এর আর্থিক সহায়তায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সাথে যৌথভাবে 'জাস্টিস রিফর্ম অ্যান্ড করাপশন প্রিভেনশন' প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের পাঁচটি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা GIZ-এর কারিগরি সহায়তায় দুদক-এর 'দুর্নীতি বিরোধী কৌশলগত পরিকল্পনা' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১৯ সালে প্রণীত ১ বছর মেয়াদি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ২০২০ সালের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. এশিয়ান ডেভালপমেন্ট ব্যাংক (UNODC Asian Development Bank, ADB), রিপাবলিক অব কোরিয়া এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে 'দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' সংক্রান্ত কারিগরি প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্নীতির অভিযোগ যাচাই-বাছাই, অনুসন্ধান, তদন্ত, প্রতিরোধ ও মামলা পরিচালনার কাজ নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরির কাজ বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন।

৩. দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় অটোমেশনের কাজ ২০১৮ সালে শুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, Inventory বিষয়ক সফটওয়্যার, গ্রন্থাগার বিষয়ক ডাটাবেজ সফটওয়্যার, সুরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, সততা সংঘের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার, দুর্নীতি বিষয়ক অপরাধ ও অপরাধীর তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়

গণশুনানি

৪.১ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিকাশে গণশুনানি

৪.২ বাস্তবায়িত গণশুনানির পরিসংখ্যান

গণশুনানি

৪.১ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিকাশে গণশুনানি

৪.১.১ ভূমিকা

গণশুনানি হচ্ছে সরকারি পরিষেবার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার একটি কার্যকর কৌশল। দুর্নীতি দমন কমিশন মূলত তৃণমূল পর্যায়েই এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে তৃণমূলের সাধারণ মানুষ তাদের অভিযোগ জানাতে পারছে। গণশুনানি অনেকটা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক। এখানে অভিযোগকারী নাগরিকগণ, সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। সকলের উপস্থিতিতে অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। আবার যেসব সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে হচ্ছে না, সেসব সমস্যা ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপে দেখা যায়, ফলোআপ গণশুনানি বাস্তবায়ন করায় দুদকের গণশুনানি বেশ কার্যকর এবং সুশাসনের বিকাশে জনপ্রিয় একটি কৌশল হিসেবে কাজ করছে।

গণশুনানিকে সরকারি সেবা প্রত্যাশী জনগণ এবং সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগের একটি প্রক্রিয়াও বলা যেতে পারে। গণশুনানিতে কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকেন। গণশুনানিতে সাধারণ সেবা গ্রহীতাদের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে হয়রানির মূলে রয়েছে নাগরিকদের অসচেতনতা এবং কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং সরকারি সেবা প্রদানে নির্ধারিত সময়-সীমা অনুসরণ না করা। গণশুনানি স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি বিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিশন ২০১৯ সালে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৮টি গণশুনানি পরিচালনা করেছে। ২০১৪ সালে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে গণশুনানির যাত্রা শুরু করে দুদক। গণশুনানিতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সমর্থন কমিশনকে গণশুনানি পরিচালনায় উৎসাহিত করে। অধিকাংশ গণশুনানিই কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে ৩৮টি গণশুনানির মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা নাগরিকদের নিকট ১,২৯৭টি অভিযোগ পাওয়া যায়, এর মধ্যে ৯৭৫টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অর্থাৎ গণশুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যেসব অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করা যায়নি, এগুলো নিষ্পত্তিতে কমিশন মনিটরিং করছে। ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে এসব অভিযোগ নিষ্পত্তিরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC) এর ১৩ অনুচ্ছেদে দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের (সুশীল সমাজ, এনজিও, গণমাধ্যম ইত্যাদি) অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রাপ্তি ও রিপোর্টিং এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২-এ নাগরিকের দুর্নীতিমুক্ত সেবা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুর্থত, প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালে সরকারি সেবা প্রদানে গণশুনানি একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নাগরিকের ক্ষমতায়ন যা গণশুনানি ও অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব।

৪.১.২ গণশুনানির উদ্দেশ্য

- সেবা প্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে সেগুলো সেবা প্রদানকারী দপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা;
- প্রতিটি সরকারি দপ্তরে নাগরিক সনদের ভিত্তিতে নাগরিকদেরকে প্রদেয় বিভিন্ন সেবার মান উন্নত করা;
- নাগরিক অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা;
- সেবা প্রত্যাশী নাগরিক এবং সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- অনিয়ম, দুর্নীতি এবং দীর্ঘসূত্রতার উৎসমূল চিহ্নিত করা;
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশাসনিক এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪.১.৩ গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো

বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ এ বর্ণিত সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামো গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কাঠামো অনুযায়ী সেবা প্রদানের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার জন্য প্রয়োজন (১) নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকের শক্তিশালী কণ্ঠস্বর (Voice), (২) নাগরিকগণ কর্তৃক সেবা প্রদানকারীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (Citizen power) এবং নাগরিকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নীতি-নির্ধারক কর্তৃক সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রণোদনা কাঠামো প্রবর্তন। গণশুনানির মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীকে নাগরিকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ করার বিষয়টির ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

৪.১.৪ গণশুনানির আইনগত কাঠামো

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) ''রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবে না.....''।
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(২) ''সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।''
- সরকার অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১ জুন ২০১৪ ও ৫ জুন ২০১৪ তারিখের অফিস স্মারকদ্বয়
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
- তথ্য প্রদানকারী সুরক্ষা আইন, ২০১২

৪.১.৫ গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরি, কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত, কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ কৌশল, কার্যকর শিক্ষা কৌশল, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ , উদ্ভাবনী গবেষণা ও উন্নয়ন কমিশনের অন্যতম কর্মকৌশল। এই কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে গণশুনানি পরিচালনা করা হচ্ছে।

সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কমিশন গণশুনানিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এটি হচ্ছে সেবাগ্রহীতা জনগণ ও সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রতা দূর করা অতীব জরুরি। প্রতিটি গণশুনানিতে কমিশনের চেয়ারম্যান অথবা কমিশনার উপস্থিত থেকে গণশুনানি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। কমিশন ইতোমধ্যে গণশুনানি পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। প্রতিটি গণশুনানি পর্যলোচনা করলে দেখা যায় সাধারণ মানুষ যেমন সরকারি সেবাগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন নন, তেমনি সরকারি সেবাপ্রদানে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ নানাভাবে যথাযথ সময়ে সেবা প্রদান না করে নাগরিকদের বঞ্চিত করে থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণ অনৈতিকভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের হয়রানি করে থাকে।

এসকল শুনানির মাধ্যমে অনেক সমস্যার যেমন তাৎক্ষণিক সমাধান করা হচ্ছে, তেমনি দুর্নীতি ও অনিয়মের উৎস শনাক্তকরণ, প্রকৃতি ও ব্যাপকতা চিহ্নিত করে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কমিশনকে নিরলসভাবে সহযোগিতা করছেন। ২০১৬ সালে দুদক গণশুনানি পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে । বর্তমানে এই নীতিমালার ভিত্তিতেই গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

এ গণশুনানি (Public Hearing) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ,সরকারি সেবা গ্রহীতা নাগরিকগণ,সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, এনজিও এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গসহ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পত্রযোগে ও টেলিফোনে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাথে পরামর্শ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর কমিশনার, ইউপি চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কমিশনারসহ সম্মানিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য গণশুনানি উন্মুক্ত থাকে।

৪.১.৬ গণশুনানির প্রত্যাশিত ফলাফল

- স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা;
- সরকারি সেবাপ্রাপ্তির নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;
- সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- নাগরিকদের সমস্যা সমাধানকল্পে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা;
- সেবা প্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তি করা;
- সেবা প্রদানের পদ্ধতির উন্নয়ন করা;
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কার্যকর নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;
- দুর্নীতির উৎস এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া এবং তার আলোকে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা;
- কর্মকর্তাদের নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা;
- সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা;
- দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সংবিধান অনুসারে সকল সময় জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। জনগণকে সেবাপ্রদান করা সরকারি কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। গণশুনানি এ দায়িত্ব পালনে একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা পদ্ধতি। কমিশন গণশুনানি পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিটি সরকারি দপ্তরকে স্থানীয়ভাবে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিয়মিত গণশুনানি ও ফলোআপ গণশুনানি মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান হচ্ছে। বর্তমানে কমিশন গণশুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করছে। দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কোনো ঘটনা গণশুনানিতে উদঘাটিত হলে তা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনিয়ম, হয়রানি, সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা কিংবা দুর্নীতিমুক্ত সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে গণশুনানি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

৪.২ বাস্তবায়িত গণশুনানির পরিসংখ্যান

২০১৯ সালে কমিশন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষসহ দেশের অপর ৩৫টি উপজেলায় সদরে অবস্থিত সকল সরকারি অফিস যেমন-উপজেলা পরিষদ, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, পল্লিবিদ্যুৎ সমিতি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিস, উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস, উপজেলা সমবায় ও সমাজ সেবা অফিস, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অফিস, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস,

উপজেলা মৎস্য অফিস এবং বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল সরকারি দপ্তরে সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর গণশুনানি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসকল গণশুনানির মাধ্যমে ২০১৯ সালে কমিশন তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের নিকট থেকে ১,২৯৭টি অভিযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে ৯৭৫টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ গণশুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। যেসব অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি, সেগুলোর নিষ্পত্তিতে কমিশন নিবিড় তদারকি করছে। প্রত্যাশা করা যায়, ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে অবশিষ্ট অভিযোগসমূহের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

সারণি-৩২ ও চিত্র-২৩-এ বিগত পাঁচ বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।

সারণি-৩২: ২০১৫, ২০১৬ , ২০১৭ , ২০১৮ ও ২০১৯ সালে বাস্তবায়িত গণশুনানির পরিসংখ্যান

বছর	গণশুনানি/ফলোআপ গণশুনানির সংখ্যা
২০১৫	০৫
২০১৬	৩০
২০১৭	৪০
২০১৮	২৭
২০১৯	৩৮

সারণিতে প্রদত্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দুদক বিগত পাঁচ বছরে ১৪০টি গণশুনানি বাস্তবায়ন করেছে।

চিত্র-২৩: ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের বাস্তবায়িত গণশুনানির পরিসংখ্যান

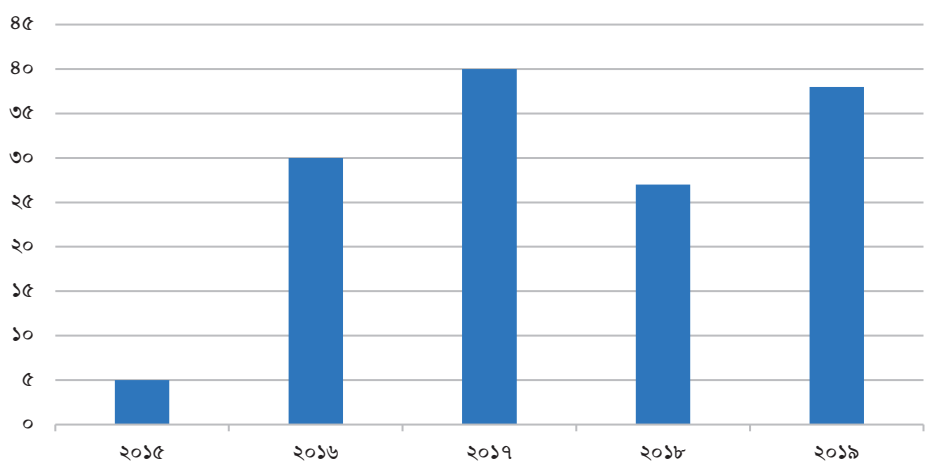

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

৫ম অধ্যায়

তথ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১ কমিশনের তথ্য ব্যবস্থাপনা

তথ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১ কমিশনের তথ্য ব্যবস্থাপনা

৫.১.১ দুদক ও তথ্য অধিকার আইন

বাংলাদেশের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তা, বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। তথ্য জানা মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। অবাধ ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের প্রকাশ প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদণ্ডকে সমৃদ্ধ করে। গোপনীয়তার সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের ঘাটতি সৃষ্টি করে। দুর্নীতি দমন কমিশন প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাসী। যে কারণেই কমিশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় কার্যালয়, সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহে তথ্য প্রদানের জন্য 'তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের' মাধ্যমে নাগরিকগণের চাহিত তথ্য প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

দুদক জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১১ অনুসরণপূর্বক নাগরিকগণের চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। কমিশন চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েও নিয়মিত তথ্য প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে। কমিশন কর্তৃক প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১১ অনুসারে কমিশনের গঠন, কাঠামো এবং কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত কোনো স্মারক, বই, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, চিঠি, প্রতিবেদন, আর্থিক বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, অডিও, ভিডিও ইত্যাদিকে নীতিমালায় 'তথ্য' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তবে দাপ্তরিক নোট সিট এবং নোট সিটের প্রতিলিপিকে তথ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কমিশনের তথ্যকে এই নীতিমালায় চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে:

ক) স্বতঃস্ফূর্ত তথ্য (কমিশন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব তথ্য প্রকাশ করবে);

খ) চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ;

গ) চাহিদা অনুযায়ী আংশিক তথ্য সরবরাহ; এবং

ঘ) অন্যান্য তথ্য, যা প্রকাশ বা প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়।

কমিশন এর কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা, সততা ও উত্তম চর্চার বিকাশে প্রণীত সকল নীতিমালা, দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে সকল প্রকার তথ্যই জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ ও প্রচার করে যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কমিশনের সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা, ৮টি বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়ের স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের পরিচালকগণ এবং ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের উপপরিচালক নাগরিকের অনুরোধের ধরন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন। যে কোনো নাগরিক তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রণীত নির্দিষ্ট ফরম্যাটে বা সাদা কাগজে কমিশনের কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং আবেদন পেশের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুরোধের উত্তর দিতে হবে। বৈধ কারণ ছাড়া তথ্য প্রদান করা না হলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অবগত রয়েছেন। তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। কমিশন তথ্য প্রাপ্তির প্রতিটি আবেদনকে আইনি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। তবে কমিশনের সকল মামলা কিংবা অভিযোগের ডাটাবেজ না থাকায় তথ্য প্রদানে কখনও কখনও বিলম্ব হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে

অভিযোগকারী অভিযোগ দাখিলের সাথে সাথেই তথ্য অধিকার আইনে তথ্যের জন্য আবেদন করেন। এসব ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই সে বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়, ফলে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। তারপরও প্রতিটি আবেদন প্রদানযোগ্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করা হয়।

সারণি-৩৩: ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে কমিশনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং প্রাপ্তির পরিসংখান

সাল	তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন সংখ্যা	তথ্য প্রদানের সংখ্যা
২০১৫	১২	১২
২০১৬	১৮	১৭
২০১৭	১৭	১৬
২০১৮	২১	২০
২০১৯	৫৩	৪৯

পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ ৫৩ জন তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৯ জনকে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৪ জনের আবেদনসমূহ বিবেচনাধীন রয়েছে। ২০১৯ সালে পূর্ববর্তী বছরের দ্বিগুণেরও বেশি সংখ্যক আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-২৪: ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও তথ্য প্রদানের চিত্র

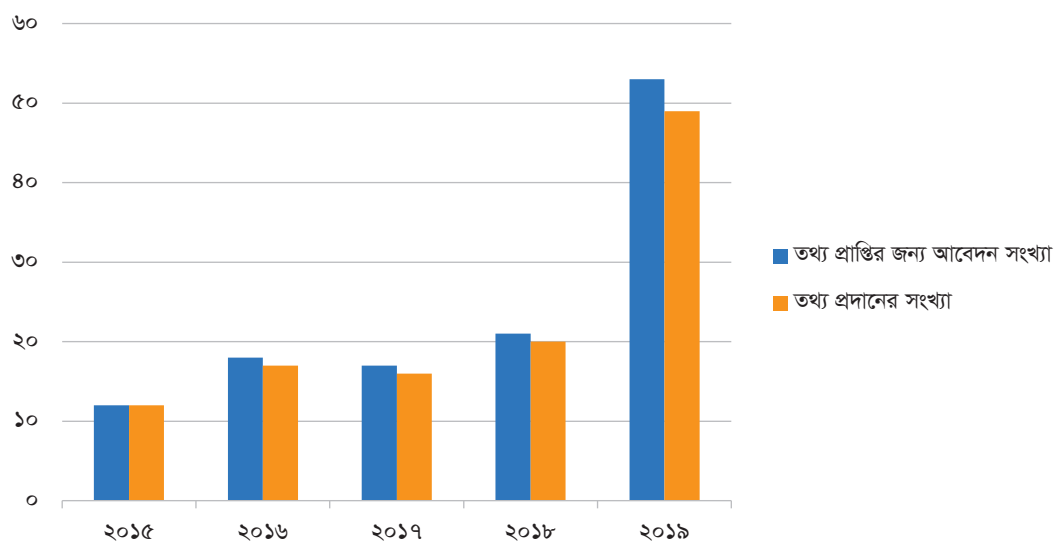

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

৬ষ্ঠ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

৬.১ কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

৬.১ কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মপরিকল্পনা বহুমাত্রিক কর্মপ্রয়াসের সমন্বয়ে সৃষ্ট কৌশল। এ কৌশলের মূল ভিত্তি হচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান। তারপরও প্রশাসনিকসহ বিভিন্ন কর্মকৌশল কমিশনকে গ্রহণ করতে হয়। বাংলাদেশ আর্থসামাজিক বিভিন্ন সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে এদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে যত নেতিবাচক কথা বলা হয়েছে, তা আজ মিথ্যা বয়ানে পর্যবসিত হয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির দিক থেকে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বের রোলমডেল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ সাফল্যের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে দেশের তৈরি পোশাক খাত, প্রবাসী আয় ও কৃষি। এসব ক্ষেত্রে সরকারের নীতিগত সহায়তা অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, দেশের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দুর্নীতি। এর পাশাপাশি আরো কিছু প্রতিবন্ধকতা যেমন দারিদ্র্য, মানসম্মত শিক্ষার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকও রয়েছে। দুর্নীতিকে মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ বলা যেতে পারে। পৃথিবীর কোনো দেশই দুর্নীতিমুক্ত নয়। প্রতিবছর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক ঘোষিত দুর্নীতির ধারণাসূচক অন্তত এমনটাই বলে। বিশ্বায়নের এই যুগে দুর্নীতিকে বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণেও বৈশ্বিক কৌশলও বিবেচনা করতে হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচার, ব্যবসার আড়ালে বিদেশে অর্থ পাচার, সাইবার ক্রাইমের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎসহ দুর্নীতির বিবর্তন প্রতিরোধ করা সত্যিই জটিল বিষয়। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে আইনগতভাবে দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ তথা দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির দায়িত্ব দুদকের। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দুদকের অসংখ্য সাফল্য যেমন রয়েছে, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাপূর্বক কমিশন অনেক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে এবং স্বীয় সীমাবদ্ধতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু দুর্বলতাও শনাক্ত করেছে।

দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। কমিশন অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনের অংশ হিসেবে সরকার এবং অন্যান্য অংশীজন যেমন : শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষাবিদ, এনজিও, গণমাধ্যম, সুশীলসমাজ, সর্বস্তরের নাগরিকদের দুর্নীতি বিরোধী অভিন্ন প্লাটফর্মে একত্রিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

৬.১.১ দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

জার্মান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা GIZ এর সহযোগিতায় প্রণীত ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার (২০১৭-২০২১) আলোকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমকে গতিশীল, কার্যকর এবং দৃশ্যমান করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন এবং ২০২০ সালের জন্য পৃথক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনায় ৮টি বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে, এগুলো হচ্ছে: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরি; কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত; দক্ষতার সাথে মামলা পরিচালনা; কার্যকর প্রতিরোধ এবং শিক্ষা কৌশল; উদ্ভাবনী গবেষণা ও উন্নয়ন; রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রতিফলন; প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা সমুন্নতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ। এসব অগ্রাধিকার বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। যেমন কমিশনের মামলায় সাজার হার ষাট শতাংশের উপরে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন দৃশ্যমান হয়েছে, কর্মকর্তাদের সক্ষমতার ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সাংবৎসরিক ভিত্তিতে কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে বলে প্রতীয়মান। কমিশন এই কর্মকৌশল পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হলে অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত, প্রসিকিউশন, প্রতিরোধ, গবেষণাসহ সকল প্রকার দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম আরো কার্যকর হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

৬.১.২ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ এবং কর্মপ্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল। ২০১৯ সালে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'এসেট ডিজক্লোজার এন্ড কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট সিস্টেমস ইন সাউথ এন্ড সাউথইস্ট এশিয়া', 'ক্রিমিনাল জাস্টিস রেসপন্স টু করাপশন', 'ইনভেস্টিগেশন অব এন্টি-করাপশন কেসেস ইনক্লুডিং প্রকিউরমেন্ট এন্ড কন্ট্রাক্ট ফ্রড্স', 'সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং সিস্টেম', 'ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস-ইনভেস্টিগেশন এন্ড প্রসিকিউশন' কোর্সসহ বিভিন্ন কোর্সে ৮২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব কর্মকর্তাদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে। এসব বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রশিক্ষণের এই ধারা অব্যাহত রেখে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অপরাধ শনাক্তে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারসহ কর্মকৌশলকে আরো মানসম্পন্ন করা হবে।

৬.১.৩ প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন

কমিশন একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তি অনুবিভাগ সৃষ্টি করেছে। এই অনুবিভাগের মাধ্যমেই কমিশনের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে। দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কমিশনের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দুর্নীতির উৎস, ধরন, তা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসহ দুর্নীতি দমনে বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান নিয়ে সমন্বিতভাবে দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কমিশনের নিজস্ব কোনো প্রশিক্ষণ একাডেমি না থাকায় একটি প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬.১.৪ অটোমেশন

অনুসন্ধান, তদন্ত, প্রসিকিউশন, গোয়েন্দা, প্রশাসনিক এবং প্রতিরোধমূলক সকল কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার কমিশনের অন্যতম কৌশল হতে পারে। তবে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে পাওয়া তথ্য বিচারিক প্রক্রিয়ায় দালিলিক সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন (এভিডেন্স অ্যাক্ট-১৮৭২) সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রতীয়মান।

কমিশন প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়। এজন্য এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (Asian Development Bank, ADB), রিপাবলিক অব কোরিয়া এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে 'দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' সংক্রান্ত কারিগরি প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্নীতির অভিযোগ যাচাই-বাছাই, অনুসন্ধান, তদন্ত, প্রতিরোধ ও মামলা পরিচালনার কাজ নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরির কাজ বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্প কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশনের কর্মপরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে হবে।

এছাড়াও দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় অটোমেশনের কাজ ২০১৮ সালে শুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, Inventory বিষয়ক সফটওয়্যার, গ্রন্থাগার বিষয়ক ডাটাবেজ সফটওয়্যার, সুরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, সততা সংঘের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার, দুর্নীতি বিষয়ক অপরাধ ও অপরাধীর তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কমিশনের নিজস্ব সক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে।

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) কর্তৃক গৃহীত অত্যাধুনিক নতুন প্রকল্প Integrated Lawful Interception System (ILIS) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানসহ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ডাটা কানেকটিভিটি কার্যক্রম চলমান আছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারীও গোয়েন্দা সংস্থার ন্যায় দুর্নীতি দমন কমিশনের ডাটা কানেকটিভিটি স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন ILIS এর সকল প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে। এর মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গতিবিধি ডিজিটালি নজরদারির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক কমিশনের কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকির বিষয়টি বিবেচনা করা হতে পারে।

৬.১.৫ গোয়েন্দা ইউনিট

দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে গোয়েন্দা তথ্য। দুর্নীতির ষড়যন্ত্র কিংবা দুর্নীতি ঘটতে যাচ্ছে এমন আগাম তথ্যও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এ উদ্দেশ্যেই কমিশন ২০১৮ সালে একজন পরিচালকের নেতৃত্বে একটি গোয়েন্দা ইউনিট গঠন করে এবং সাময়িকভাবে গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম শুরু করে। প্রয়োজনীয় লোকবল, সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য সুবিধাদি সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিকরণ, পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ এবং অতিরিক্ত জনবল এর চাহিদার বিষয়টি দুদক-এর চাকরি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়টি কমিশনের ২০১৯ এর কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হয়। সে মোতাবেক কমিশনের গোয়েন্দা কার্যক্রম চলছে। গোয়েন্দা ইউনিটের মাধ্যমে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ পাওয়া যায়। বস্তুনিষ্ঠ এসব অভিযোগের মাধ্যমে বেশকিছু অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। কমিশনের গোয়েন্দা কার্যক্রম জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। একই ইস্যুতে একাধিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে একটি যৌথ গোয়েন্দা টাস্কফোর্স গঠন করে এবং সুনির্দিষ্ট গাইডলাইনের আলোকে তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক কমিশনে উপস্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬.১.৬ সততা স্টোর স্থাপন

প্রাত্যহিক জীবনে সততা চর্চার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সততা স্টোর। সততা স্টোর এখন দেশ-বিদেশে সমাদৃত। ইতোমধ্যেই কমিশন ৪,১৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর স্থাপন করেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্ব-স্ব উদ্যোগে সততা স্টোর স্থাপন করছে। সততা স্টোর এবং সততা সংঘের কার্যক্রমের ফলে শিক্ষার্থীদের মননে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে কি না তা নিরূপণের জন্য বেইজ-লাইন নির্ধারণ করা সমীচীন। নিধারিত বেইজ লাইনকে ভিত্তি ধরে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার বিষয়টি কমিশন বিবেচনা করতে পারে।

৬.১.৭ প্রসিকিউশন ইউনিটকে শক্তিশালীকরণ

মামলায় অপরাধীদের বিচারিক আদালতে সাজার হার কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তদন্ত ও প্রসিকিউশনের সক্ষমতা নির্ণয়ের অন্যতম সূচক। কমিশনের আইন অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রসিকিউশন ইউনিটের মাধ্যমে আদালতে মামলা পরিচালনা করা হয়। মামলার একটি ডেটাবেজ তৈরিপূর্বক একজন আইনজীবীর নিকট মামলার সংখ্যা, মামলাগুলোর পর্যায়ভিত্তিক হালনাগাদ অবস্থা, বিচারাধীন কোর্ট এবং মামলার বর্তমান অবস্থা জানার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের প্রসিকিউটরদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা সংস্কার করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রসিকিউশন ইউনিটকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর এবং জবাবদিহিমূলক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। মামলার আলামত, জব্দ তালিকাসহ বিচারকার্যে ব্যবহৃত সকল প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬.১.৮ কমিশনের নিজস্ব স্বচ্ছতা

দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিশ্বস্ততা, সততা ও অধ্যবসায়ের সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। কোনোরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না। চারিত্রিক স্খলন যেমন ঘুষ গ্রহণ, দুর্নীতি, অসামাজিক কার্যকলাপে সম্পৃক্ত হবেন না। সাধারণ মানুষ এমনটাই প্রত্যাশা করে। আবার 'দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা-২০০৮' কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাধারণ আচরণের কতিপয় বিধান এমনই। প্রাতিষ্ঠানিক জনআস্থা বিকাশে দুদক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্ব-স্ব স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এজাতীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের ন্যূনতম চারিত্রিক স্খলন জনআস্থার জন্য বিশাল হুমকি। তাই কমিশনের অভ্যন্তরীণ সুশাসন তথা কর্মীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে গোয়েন্দা ইউনিট, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি, তথ্য প্রযুক্তি ও প্রশাসন অনুবিভাগের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থাপনা সংযোজন করা যেতে পারে। প্রতিটি স্পর্শকাতর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত তথ্য ও গোয়েন্দা তথ্যের সমন্বয়ে নিয়মিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৬.১.৯ জনসংযোগ বৃদ্ধি

জনসংযোগ হচ্ছে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত তথ্যের প্রবাহ সৃষ্টি করার এক বিরামহীন কর্মপ্রয়াস। অত্যন্ত স্পর্শকাতর এ দায়িত্বপালনে পেশাদারিত্বের কোনো বিকল্প নেই। এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন করে আস্থা অর্জন করা। দুর্নীতি দমন কমিশন বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী।

কেবল কমিশনের অনুমোদিত সিদ্ধান্তসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে গণমাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। কমিশন সাধারণত প্রেসব্রিফিং, প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করে থাকে। শুধু গণমাধ্যম নয় কমিশন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করছে। এসব তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশন কোনো ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা যাতে ভূলুণ্ঠিত না হয় সে বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকে। গণমাধ্যম কর্মীরা তাদের নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করেও কখনও কখনও সংবাদ প্রচার বা প্রকাশ করে থাকে। কমিশন প্রাঙ্গন ও সংলগ্ন এলাকায় গণমাধ্যমকর্মীদের সরব উপস্থিতি দেখা যায়।

কমিশন জনসংযোগ কার্যক্রমকে গতিশীল এবং জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনসংযোগ দপ্তরকে শক্তিশালী করার লক্ষে একজন পরিচালকের নেতৃত্বে জনসংযোগ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। কমিশন জনসংযোগের জন্য অনলাইন বা বিমূর্ত যোগাযোগ (Online or Virtual Communication) ব্যবস্থাপনা সংযোজন করতে পারে।

৬.১.১০ কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রণোদনা

কমিশনের কর্মকতা-কর্মচারীগণ সীমাহীন ঝুঁকির মধ্যে কমিশন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তাই অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ ঝুঁকি ভাতার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান। কমিশন এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৬.১.১১ গবেষণা কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর-১৭ ধারার বিধান অনুসারে কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা। এ লক্ষ্যে কমিশন ২০১৮ সালে তিনটি পৃথক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, যা অদ্যাবধি চলমান। কমিশনের চলমান এসব গবেষণা দ্রুত সম্পন্ন করে, কমিশন নতুন নতুন ইস্যুতে গবেষণা শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৬.১.১২ কমিশনের কর্মপরিবেশ

কমিশনের প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি কার্যালয়ের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোসহ বিভিন্ন লজিস্টিক সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। 'রাঙ্গামাটি, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প এবং 'নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহের ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কমিশনের সকল বিভাগীয় কার্যালয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয় নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কমিশনের নিজস্ব ভবন (প্রধান কার্যালয়) তথা দুদক ভবন নির্মাণের বিষয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আধুনিক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি ভবন নির্মিত হলে কমিশনের অবকাঠামোগত সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে।

৬.১.১৩ দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের প্রচারণা

কমিশন বিভিন্ন তথ্যচিত্র, পোস্টার, স্টিকার, লিফলেটের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমকে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। তারপরও সাধারণ মানুষ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং এ আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ সম্পর্কে যথাযথ অবহিত নন। এ কারণে কমিশনে অজস্র অভিযোগ আসলেও তা থেকে অনুসন্ধানযোগ্য অভিযোগের সংখ্যা খুবই কম। আবার অনুসন্ধান করে মামলা দায়ের করার মতো অভিযোগের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এ প্রেক্ষাপটে দুদক-এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, পরিপত্র এবং অফিস আদেশসমূহকে একীভূত করে একটি ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা যেতে পারে। এই ম্যানুয়ালের আলোকে তথ্য চিত্র, বুকলেট, পোস্টার, লিফলেট তৈরি করে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.১.১৪ আন্তর্জাতিক সংযোগ

বিশ্বায়নের যুগে কোনো দেশের একক চেষ্টায় বৈশ্বিক সমস্যার সমাধান করা প্রায় অসম্ভব। দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন এগেইন্সট করাপশন-এর সদস্য রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা হিসেবে কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশীদারিত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনে বিশ্বাসী। কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের ১৪ জুন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে ভুটান দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৮ সালে দুদক ও দি ইনভেস্টিগেটিভ কমিটি অব দি রাশিয়ান ফেডারেশন (আইসিআরএফ) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। একইভাবে ২০১৯ সালে ভারতের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে দুদক।

এই সমঝোতা স্মারকে দুর্নীতির প্রাথমিক অনুসন্ধান, শনাক্তকরণ, প্রমাণীকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ অভিজ্ঞতা বিনিময়, উত্তম চর্চা, দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন বিষয় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশন একই উদ্দেশ্যে ইন্দোনেশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়াসহ প্রায় ১৮টি দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। দুদকের মামলায় এমন অসংখ্য আসামি রয়েছেন যারা বিদেশে পালিয়েছেন মর্মে জানা যায়। এসব অর্থ লোপাটকারীদের আইন আমলে আনার জন্য ইন্টারপোলের পাশাপাশি ঐসব দেশের দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাসমূহের সঙ্গে দুদকের পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৭ম অধ্যায়

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

৭.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৭.২ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

৭.৩ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

৭.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

প্রশাসন অনুবিভাগের মাধ্যমে কমিশন নিজস্ব মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণ করে আর্থিক আয়-ব্যয় নির্বাহ এবং হিসাব সংরক্ষণ করা, অবকাঠামোসহ সকল প্রকার ভৌতসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে দেশের দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও সততা চর্চার বিকাশে দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, কর্মোদ্যোগী, মননশীল মানবসম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণেই কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৭-২০২১) কর্মকৌশলের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সক্ষম মানবসম্পদ গড়ে তোলার অন্যতম উপায় হচ্ছে নিবিড় প্রশিক্ষণ। কমিশন কেবল ২০১৯ সালেই ৮২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী-প্রসিকিউটরকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বিগত চার বছর ধারাবাহিকভাবে এ জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নলেজ শেয়ারিং করতে হয়েছে। এসব নলেজ শেয়ারিং অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার, সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকেছেন। এর মাধ্যমে কমিশন নিজ নিজ কর্মে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে।

এছাড়া প্রশাসন অনুবিভাগ কমিশনের নিজস্ব কর্মপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত, কার্যকর প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ কৌশল তথা সার্বিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সর্বোচ্চ উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু অফিস আদেশ, পরিপত্র, অফিস স্মারক জারি করেছে। এসবের মাধ্যমে কমিশনের বেশ কিছু কার্যক্রমের বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছে। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক ও সৃজনশীল কৌশল প্রয়োগ করে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অন্যতম প্রশাসনিক দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। দুদকের প্রশাসন অনুবিভাগ এই উদ্দেশ্যেই বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।

এসব কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সিলেবাসের আলোকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনার জন্য কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রেডিং সিস্টেম চালুকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের প্রতিপালনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, সম্পদ সংক্রান্ত অভিযোগসহ সকল প্রকার অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনানুগ কৌশল প্রবর্তন করা ইত্যাদি।

কমিশনের এ অনুবিভাগ একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগের সকল কার্যক্রম সরাসরি তদারক করেন দুদক সচিব। কমিশনের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলা, প্রণোদনাসহ সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ রেগুলেটরি কার্যক্রম এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। কমিশনের জন্য যোগ্য কর্মী বাছাই বা নিয়োগ, শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে দণ্ড এবং যোগ্যদের পদোন্নতিসহ সকল প্রকার কল্যাণমূলক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এ বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

৭.১.১ প্রশাসন অনুবিভাগের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- দুর্নীতি দমন কমিশনের নবনির্মিত ভবনের ষষ্ঠ তলাতে অফিস-কাম-ব্যারাক স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের যত্নের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও ২০১৯ সালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পরিচালক ও উপপরিচালকগণের জন্য কমিশনের মূল ভবন ও নতুন ভবনের কক্ষসমূহ পুনর্বিন্যাস করে দাপ্তরিক কাজের উপযোগী করা হয়েছে। দুদকের নবসৃজিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী নতুন ২ জন মহাপরিচালককে পদায়ন করা হলে তাদের কক্ষ সজ্জিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, উপসহকারী পরিচালক এবং শাখার কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট তলাভিত্তিক বসানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়ের ব্যারাক-কাম-গ্যারেজ ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলাতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও PABX এর সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়ের ২০০৪ সালে স্থাপিত PABX সিস্টেম অকার্যকর হওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন PABX সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
- এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (Asian Development Bank, ADB), রিপাবলিক অব কোরিয়া এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে 'দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' সংক্রান্ত কারিগরি প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্নীতির অভিযোগ যাচাই-বাছাই, অনুসন্ধান, তদন্ত, প্রতিরোধ ও মামলা পরিচালনার কাজ নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরির কাজ বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় অটোমেশনের কাজ ২০১৮ সালে শুরু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, Inventory বিষয়ক সফটওয়্যার, গ্রন্থাগার বিষয়ক ডাটাবেজ সফটওয়্যার, সুরক্ষিত ফাইল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার, সততা সংঘের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার, দুর্নীতিবিষয়ক অপরাধ ও অপরাধীর তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

- ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) কর্তৃক গৃহীত অত্যাধুনিক নতুন প্রকল্প Integrated Lawful Interception System (ILIS) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানসহ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ডাটা কানেকটিভিটি কার্যক্রম চলমান আছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থার ন্যায় দুর্নীতি দমন কমিশনের ডাটা কানেকটিভিটি স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন ILIS এর সকল প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশনের সকল ধরনের কার্যক্রম এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনসাধারণকে জানানোর জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে এবং তা ফেসবুক কর্তৃপক্ষ থেকে অফিসিয়ালি ভেরিফাইড করা হয়েছে, যাতে করে জনসাধারণ কমিশনের নিজস্ব পেইজ কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। এছাড়াও কমিশনের জন্য টুইটার এবং ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে, যেখানে নিয়মিত তথ্য প্রদানসহ দুর্নীতি বিরোধী প্রচারণা চলমান আছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্র দুদক হটলাইন (১০৬) এর কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান রাখার জন্য হটলাইন এর নিয়মিত মেইন্টেন্যান্স এবং প্রাথমিক কারিগরি সহায়তা কমিশনের নিজস্ব আইসিটি শাখা নিশ্চিত করছে। কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটকে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আরো গতিশীল করার জন্য ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এর সহায়তা নেয়া হচ্ছে। স্বল্প পরিসরে দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য ওয়াকিটকি ব্যবহারের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দের নিমিত্ত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বরাবর আবেদন করা হয়েছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশনে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা অফিস বিশেষ করে জেলা প্রশাসকবৃন্দ ও ইউএনওগণের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

- বায়োমেট্রিক স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশনে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিজিটাল নথি নম্বর ব্যবহার শুরু হয়েছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশনে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয়কার্য শুরু করা হয়েছে।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্য পূরণে দুদকের নতুন সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রযুক্তি অনুবিভাগ সৃজনের পর মহাপরিচালক পদায়নসহ প্রয়োজনীয় জনবল দিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

- দুদকের কার্যক্রমকে অটোমেটেড করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সফটওয়্যার এবং আইটি (সফটওয়্যার/হার্ডওয়্যার) সাপোর্ট সার্ভিস সিস্টেম, ডিজিটাল আর্কাইভিং (অডিও, ভিডিও, গণশুনানি, গবেষণাপত্র, প্রকাশনা ইত্যাদি) সহ দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

- রাঙামাটি, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প এবং নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি অফিস ভবনটি ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে কমিশনের সচিব উদ্বোধন করেন ; কুষ্টিয়া অফিস ভবন ১১ জুলাই ২০১৯ তারিখে দুদক কমিশনার (তদন্ত) উদ্বোধন করেন এবং ময়মনসিংহ অফিস ভবন ৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে দুদক কমিশনার (অনুসন্ধান) উদ্বোধন করেন। নোয়াখালী অফিস ভবনটি ১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কমিশনার (তদন্ত) এবং হবিগঞ্জ অফিস ভবন ২৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কমিশনের সচিব উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে । ফলে দুদকের নথি পত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

- দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের দুর্নীতি হ্রাস, দুদকের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার জন্য প্রধান কার্যালয় ও ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় অটোমেশন করা হচ্ছে। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ :
  - ✓ প্রকল্পটির আওতায় গত ১৩/০১/২০১৯ হতে ১৯/০১/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত দুদকের ১০জন কর্মকর্তার একটি ব্যাচ চীনের ম্যাকাওয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং দেশে 'ভূমি ব্যবস্থাপনার' ওপর চারটি ব্যাচে মোট ১২০ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ১০জন কর্মকর্তার একটি ব্যাচ ভারতের সিবিআইতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
  - ✓ 'দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি'-এর ওপর মোট আটটি ব্যাচে ২৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর মধ্যে ইতোমধ্যে ৭টি ব্যাচে ২১০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে দেশে-বিদেশে আরও প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
  - ✓ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা এবং সিলেট বিভাগের ৫০ জন করে ২৫০ জন প্রতিরোধ কমিটির সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে আরও প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
  - ✓ সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সততা প্রমোট করার জন্য দেশের ৪৯৪টি উপজেলা হতে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে পর্যায়ক্রমে পুরস্কার প্রদানের কাজ চলমান;
  - ✓ ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সকল ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।
  - ✓ দুদকের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য দুটি মাইক্রোবাস ক্রয়;
  - ✓ দুদকের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ১৫০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং ১৫০টি ইউপিএস ক্রয়;

- দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ইনফরমেশন টেকনোলজি ব্যবহার করে অনুসন্ধান ও তদন্ত এবং বিচার কাজের অগ্রগতি মনিটরিংসহ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির সময় হ্রাস করার কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ :
  - ✓ প্রকল্পের আওতায় সফট্ওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান Technovista কর্তৃক IPMS সফট্ওয়্যার তৈরির কাজ চলমান;
  - ✓ প্রকল্পের প্রকল্প সাহায্যের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Technohaben-PMTC JV) কর্তৃক 'দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিরূপণ' শীর্ষক গবেষণার কার্যক্রম চলমান;
  - ✓ প্রকল্পের জিওবি বরাদ্দের আওতায় 'কার্যকরভাবে দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্তের অন্তরায়সমূহ নিরূপণ' বিষয়ের ওপর নিয়োগকৃত গবেষক কর্তৃক গবেষণা চলমান;
  - ✓ IPMS Software সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য কমিশন থেকে Software Implementation Committee গঠন করা হয়েছে;
  - ✓ Technovista-কে দুর্নীতি দমন কমিশনের আইন ও বিধি-বিধান এর আলোকে কমিশনের পক্ষে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং IPMS সফট্ওয়্যার সফল বাস্তবায়নের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করার নিমিত্ত সিস্টেম অ্যানালিস্টকে কমিশনের ফোকাল পার্সন হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

৭.১.২ দুদক সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বণ্টন

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়, ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ২২টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে ২,১৪৬ জন কমর্কর্তা ও কর্মচারীর জন্য সরকার অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে, দুদকের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মানবসম্পদ বণ্টন তালিকা নিচের সারণি-৩৪-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৩৪: দুদকের মানবসম্পদ বণ্টন

ক্রমিক নম্বর	পদবি	প্রধান কার্যালয়		বিভাগীয় কার্যালয়		সমন্বিত জেলা কার্যালয়		সর্বমোট	
		সৃজিত	কর্মরত	সৃজিত	কর্মরত	সৃজিত	কর্মরত	সৃজিত	কর্মরত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	চেয়ারম্যান	১	১	০	০	০	০	১	১
২	কমিশনার	২	২	০	০	০	০	২	২
৩	সচিব	১	১	০	০	০	০	১	১
৪	মহাপরিচালক	৮	৮	০	০	০	০	৮	৮
৫	পরিচালক	২৯	২৪	৮	৮	০	০	৩৭	৩২
৬	সিস্টেম অ্যানালিস্ট	২	১	০	০	০	০	২	১
৭	একান্ত সচিব (চেয়ারম্যান ও কমিশনার)	৩	৩	০	০	০	০	৩	৩
৮	একান্ত সচিব (কমিশনের সচিবের)	১	১	০	০	০	০	১	১
৯	উপপরিচালক	১৪৭	৫৫	৮	০	৩৬	২২	১৯১	৭৭
১০	প্রসিকিউটর	১০	০	০	০	০	০	১০	০
১১	মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	১	০	০	০	০	০	১	০
১২	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	২	০	০	০	০	০	২	০
১৩	প্রোগ্রামার/স.সি. অ্যানালিস্ট	২	১	০	০	০	০	২	১
১৪	সহকারী প্রোগ্রামার	৪	০	০	০	০	০	৪	০
১৫	সহকারী পরিচালক	২১৫	৪৯	৮	২	১০৮	৪৭	৩৩১	৯৮
১৬	মেডিকেল অফিসার	১	০	০	০	০	০	১	০
১৭	সহকারী পরিচালক (তথ্য ও যোগাযোগ)/জনসংযোগ কর্মকর্তা	২	১	০	০	০	০	২	১
১৮	প্রোটোকল অফিসার	১	০	০	০	০	০	১	০
১৯	সহকারী পরিচালক (ইলেকট্রিক্যাল)	২	০	০	০	০	০	২	০
	প্রথম শ্রেণি	৪৩৪	১৪৭	২৪	১০	১৪৪	৬৯	৬০২	২২৬
২০	উপসহকারী পরিচালক	২০৫	২৪	৮	১	১৪৪	৩৮	৩৫৭	৬৩
২১	কোর্ট পরিদর্শক	১০	০	০	০	৩৬	১৩	৪৬	১৩
২২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২	১	০	০	০	০	২	১
২৩	পরিবহন কর্মকর্তা	১	১	০	০	০	০	১	১
২৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	০	০	০	০	১	০
	দ্বিতীয় শ্রেণি	২১৯	২৬	৮	১	১৮০	৫১	৪০৭	৭৮
২৫	কম্পিউটার অপারেটর	৮						৮	০
২৬	নার্স	১						১	০
২৭	ফার্মাসিস্ট	১						১	০
২৮	প্রধান সহকারী	২৫	২২	৮	৬	০	০	৩৩	২৮
২৯	সহকারী পরিদর্শক	৫	২	০	০	৭২	৬৭	৭৭	৬৯
৩০	হিসাব রক্ষক	২	২	৮	৭	০	০	১০	৯

ক্রমিক নম্বর	পদবি	প্রধান কার্যালয়		বিভাগীয় কার্যালয়		সমন্বিত জেলা কার্যালয়		সর্বমোট	
		মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩১	সাঁটলিপির-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১২	১২	০	০	০	০	১২	১২
৩২	লাইব্রেরীয়ান/ক্যাটালগার	২	২	০	০	০	০	২	২
৩৩	সাটঁমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	২৮	১০	৮	৬	০	০	৩৬	১৬
৩৪	উচ্চমান সহকারী/সহকারী	৪৯	২৩	৮	৪	৩৬	২০	৯৩	৪৭
৩৫	কোর্ট সহকারী (এএসআই)	২০	১৫	০	০	৭২	৪৫	৯২	৬০
৩৬	ক্যাশিয়ার	২	১	০	০	০	০	২	১
৩৭	ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর	১৩৩	৩৪	৮	৫	৩৬	১৫	১৭৭	৫৪
৩৮	অভ্যর্থনাকারী কাম টেলিফোন অপারেটর	২	২	০	০	০	০	২	২
৩৯	ড্রাইভার	৭৭	২৮	৮	৭	৭২	২২	১৫৭	৫৭
৪০	স্বাস্থ্য সহকারী	১						১	০
তৃতীয় শ্রেণি		৩৬৮	১৫৩	৪৮	৩৫	২৮৮	১৬৯	৭০৪	৩৫৭
৪১	ডেসপাচ রাইডার	৪	২	০	০	০	০	৪	২
৪২	কনস্টেবল	৮৩	৮১	১৬	৭	১৮০	৫৮	২৭৯	১৪৬
৪৩	ড্রাইভার কনস্টেবল*	২	১	০	০	০	০	২	১
৪৪	নিরাপত্তারক্ষী	১৬	৮	৮	৪	০	০	২৪	১২
৪৫	দপ্তরি*	১	১	০	০	০	০	১	১
৪৬	অফিস সহায়ক	৫২	১৮	৮	৭	০	০	৬০	২৫
৪৭	যানবাহন ক্লিনার	৪	০	০	০	০	০	৪	০
৪৮	ক্লিনার	১১		৮	০	৩৬	০	৫৫	০
৪৯	গার্ড	৪	০	০	০	০	০	৪	০
চতুর্থ শ্রেণি		১৭৭	১১১	৪০	১৮	২১৬	৫৮	৪৩৩	১৮৭
সর্বমোট=		১১৯৮	৪৩৭	১২০	৬৪	৮২৮	৩৪৭	২১৪৬	৮৪৮

৭.১.৩ পদোন্নতি

২০১৯ সালে মোট ১৪৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এসব পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসারে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল, সিনিয়রিটি ও মেধাক্রমের সমন্বয়ে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের আলোকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৩৫: পদোন্নতি সংক্রান্ত

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
১	পরিচালক	১৫
২	উপপরিচালক	৩১
৩	সহকারী পরিচালক	৩৫
৪	হিসাবরক্ষক	০১
৫	প্রধান সহকারী	২৫
৬	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১
৭	উচ্চমান সহকারী	২৭
৮	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১
৯	কোর্ট সহকারী (এএসআই)	১৩
	সর্বোমোট =	১৪৯

সারণি-৩৬: সরাসরি নিয়োগ সংক্রান্ত

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
১	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০২
২	লাইব্রেরিয়ান	০২
৩	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৯
৪	অভ্যর্থনাকারী-কাম-টেলিফোন অপারেটর	০১
৫	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	১৩
৬	ড্রাইভার	০৪
	মোট =	৩১

৭.১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

অর্থনৈতিক, সামাজিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্য রয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতির মতো ঘৃণ্য অপরাধের ব্যাপকতাও রয়েছে। দেশের আর্থসামাজিক এই অগ্রগতির চাকাকে রুদ্ধ করতে চায় দুর্নীতি। দুর্নীতি আজ বৈশ্বিক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত। অনেক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এদেশ থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ বিদেশে পাচার করেছে। কমিশনের মামলার অনেক আসামি আজ দেশ থেকে পালিয়েছেন। এসব অপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য ইন্টারপোলের সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে, পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক যেসব আইনি সহযোগিতার কৌশল রয়েছে সেগুলোর ব্যবহারেরও চেষ্টা চালাচ্ছে কমিশন। অর্থাৎ দুর্নীতি যেমন বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে তেমনি এর তদন্ত প্রক্রিয়াও বৈশ্বিক তদন্তের অংশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তাই কমিশন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করেছে। ২০১৮ সালের ন্যায় ২০১৯ সালেও কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় 'এসেট ডিসক্লোজার এন্ড কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট সিস্টেমস ইন সাউথ এন্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া', 'ক্রিমিনাল জাস্টিস রেসপন্স টু করাপশন', 'ইউজ অব ওপেন সোর্স ডেটা ইন ক্রিমিনাল এন্ড ফিনানসিয়াল ইনভেস্টিগেশন অব ক্রাইমস', ভূমি ব্যবস্থাপনা, 'সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং' কোর্সসহ বিভিন্ন কোর্সে ৮২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী-প্রসিকিউটরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ।

৭.১.৫ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ

বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগে কোনো দেশের একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দুর্নীতির মতো বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব । এ কারণেই দুদক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্নীতিবিরোধী সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ইস্যুতে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছে। ইতোমধ্যে তিনটি দেশের এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। আরো বেশ কয়েকটি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন দুর্নীতি দমন , নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সভা, সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। এসব সভা সেমিনারে কমিশন দেশের অর্থ পাচারকারীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা চেয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছে।

সারণি-৩৭: ২০১৯ সালে কতিপয় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে দুদক-এর অংশগ্রহণ

Serial No.	Name of Training / Meeting/ Seminar/ Workshop	Duration	No. of Participants	Name of Asociate Organization	Name of Country
1	Workshop on “Asset Disclosure and Conflict of Interest Systems in South and Southeast Asia”	11-13 June 2019	02	UNODC	Thailand
2	Training Course on “Executive Certificate for Strategic Management of Anti-Corruption Program”	22July to 02 August 2019	01	Malaysia	Malaysia
3	Issue-focused Training Course on “Criminal Justice Response to Corruption”	06 October to 16 November 2019	01	JICA	Japan
4	Workshop On “Use of Open Source data in Criminal and Financial Investigations of Corruption Crimes”	18-20 September	02	UNODC	Thailand
5	Training on 22nd APG Annual Meeting,	18-23 August	01	ACC	Australia
6	Meeting on Implementation Review Group (First Resumed Tenth Session) and Prevention of Corruption Regarding Open Ended Inter-governmental Working Group.	02-04 September And 04 to 06 September 2019	04	Austria	Austria
7	Training on ICAC Chief Investigators Command Course.	01 to 30 November 2019	01	ACC	Hongkong
8	“Investigation of Anti-Corruption Cases including Procurement and Contract Frauds”.	16-27 September 2019	10	ACC	India

৭.২ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা রয়েছে। কমিশন বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ করে সরকারের নিকট আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে থাকে। সরকার কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। বাজেট অনুমোদিত হলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল কর্তৃক দুদক হিসাব প্রাক-নিরীক্ষণ ছাড়া সরকারের কাছ থেকে কমিশনের কোনো পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয় না। প্রশাসন অনুবিভাগের অর্থ ও হিসাব শাখা অর্থায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা-সম্পর্কিত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকে। নিয়মিত অডিট সম্পন্ন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) সারণি-৩৮ ও ৩৯ এ দেখানো হলো :

সারণি-৩৮: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দুদকের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	রাজস্ব	মূলধনি
২০১৮-১৯ বাজেট	৯,৯৯,৭৬০	২,২৮,৪০০	১২,২৮,১৬০	১০,০৭,৩৬০	২,২০,৮০০

সারণি-৩৯: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব ও মূলধনি (উন্নয়ন সহ) ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		২০১৮-১৯	
	অর্থনৈতিক কোড ও খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
রাজস্ব ব্যয়	৩১১১১০১ মূল বেতন (অফিসার)	১৭,১৪,৯২	১০,৮৫,১৯
	৩১১১২০১ মূল বেতন (কর্মচারী)	১২,৮৯,৬০	৭,১৫,৯৭,
	ভাতাদি	২৩,৭০,৬৭	২৩,৪৬,৮০
	৩২১১ পণ্য ও সেবার ব্যবহার	২৬,৫২,৩৯	২২,৮১,৫০
	৩২৫৮ মেরামত	১,৪৬,১০	১,৪১,৪৬
	থোক বরাদ্দ	১,০০,০০	৭৮,৬০
	প্রকল্প	২২,৭৯	১৯,১৯
মোট রাজস্ব ব্যয়	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৮২,৯৬,৪৭	৬৬,৬৮,৭১
মোট মূলধনি ব্যয়		৩৯,৮৫,১৩	৩০,৪৫,৪০
সর্বমোট =		**১২২,৮১,৬০**	**৯৭,১৪,১১**

চিত্র-২৫: কমিশনের প্রকৃত অর্থ ব্যয়

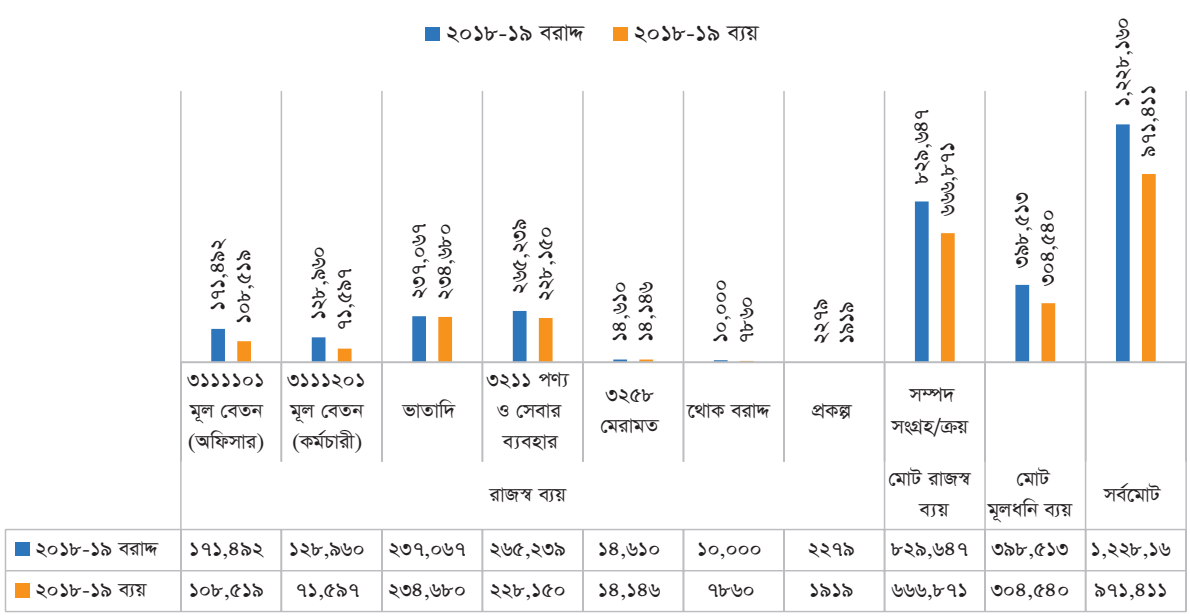

	৩১১১১০১ মূল বেতন (অফিসার)	৩১১১২০১ মূল বেতন (কর্মচারী)	ভাতাদি	৩২১১ পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৩২৫৮ মেরামত	থোক বরাদ্দ	প্রকল্প	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	মোট রাজস্ব ব্যয়	মোট মূলধনি ব্যয়	সর্বমোট
২০১৮-১৯ বরাদ্দ	১৭১,৪৯২	১২৮,৯৬০	২৩৭,০৬৭	২৬৫,২৩৯	১৪,৬১০	১০,০০০	২২৭৯	৮২৯,৬৪৭	৩৯৮,৫১৩	১,২২৮,১৬০	
২০১৮-১৯ ব্যয়	১০৮,৫১৯	৭১,৫৯৭	২৩৪,৬৮০	২২৮,১৫০	১৪,১৪৬	৭৮৬০	১৯১৯	৬৬৬,৮৭১	৩০৪,৫৪০	৯৭১,৪১১	

৭.২.১ দুদকের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

গোয়েন্দা এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হচ্ছে। 'দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০০৮' অনুসারে দুদকের কর্মচারীগণ 'বিশ্বস্ততা, সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত কমিশনের চাকরি করিবেন এবং ক্ষমতার কোনরূপ অপব্যবহার করিবেন না'। একই বিধিমালায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক কর্মচারী আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থতা বা অনীহা এবং চারিত্রিক স্খলন (ঘুষ গ্রহণ, অনৈতিক বা অসামাজিক কার্যকলাপ ইত্যাদি) বিষয়ক আচরণ কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং এই সকল ক্ষেত্রে কঠোরতম ও দ্রুততম শাস্তি নিশ্চিত করা হইবে।'

কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে কমিশনের কর্মীগণ হবেন সৎ, নিষ্ঠাবান, উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই কমিশন কর্মকর্তাদের কর্ম-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন প্রশাসনিক কৌশল, প্রযুক্তিগত কৌশল সর্বোপরি গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে। শাস্তি এবং প্রণোদনা দুটোই সমান্তরালে পরিচালনা করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্তে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। এই বিধির ১৯(১) ধারায় বলা হয়েছে- 'কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী আইন ও এই বিধিমালার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কি না কিংবা কোনো ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করিতেছেন কি না অথবা আইন ও এই বিধিমালার আওতায় কোনো অপরাধ করিয়াছেন কি না তাহা সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, নজরদারি, অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়ের ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন নামে একটি কমিটি থাকিবে।'

কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি ২০১৯ সালেও একাধিক বৈঠক করেছে। বেশকিছু প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । ২০১৯ সালে কমিশনের ২জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কঠোর সাজা ও ০১ জন কর্মচারীকে স্বল্পমাত্রার সাজা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ সালে দুদক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়েরের সংখ্যা এবং মামলার ফলাফল তালিকা নিচের সারণি-৪০-এ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-৪০: ২০১৯ সালে দুদকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া বিভাগীয় পদক্ষেপসমূহ

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরের জের	০৮
২০১৯ সালে গৃহীত	২৮
২০১৯ সালে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	৩৬
২০১৯ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	০৯
কঠোর সাজা	০২
স্বল্পমাত্রার সাজা	০১
অন্যভাবে নিষ্পত্তি	০৬

- কঠোর সাজার মধ্যে রয়েছে চাকরি থেকে অপসারণ, বাধ্যতামূলক অবসর, বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনতকরণ ইত্যাদি।
- স্বল্পমাত্রার সাজার মধ্যে রয়েছে তিরস্কার, পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত রাখা ইত্যাদি।

৭.৩ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

৭.৩.১. সম্পাদিত কাজ পর্যবেক্ষণ

কমিশনের সকল কার্যক্রমের নিবিড় তদারকির আরেকটি প্রচলিত প্রক্রিয়া হচ্ছে অধীন দপ্তরসমূহে সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন, বিশদ পরিদর্শন কিংবা অভ্যন্তরীণ অডিট। বর্তমানে কমিশনের সংস্থাপন শাখার মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি অনুবিভাগ, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এসব পরিদর্শনে আর্থিক ব্যয়সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়াদি, অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্তসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

দুদকের সংস্থাপন শাখা সম্পাদিত কাজ অভ্যন্তরীণভাবে পরিবীক্ষণ করে থাকে। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত পরিদর্শন দুদকের বিভাগীয় ও সমন্বিত কার্যালয়ের কাজ পর্যবেক্ষণ করার দুটি পদ্ধতি। দুদক প্রধান কার্যালয়ের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ এই পরিদর্শন কাজ করে থাকেন। বিশেষ ক্ষেত্রে মাননীয় কমিশনারদ্বয় প্রধান কার্যালয়ের অনুবিভাগসমূহসহ বিভিন্ন কার্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শন শাখা নিয়মিতভাবে এই পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং প্রাপ্ত ফলাফল দুদক চেয়ারম্যানের কাছে পেশ করে থাকে। ২০১৯ সালে সম্পন্নকৃত কিছু পরিদর্শন তথ্য সারণি-৪১-এ দেওয়া হয়েছে।

সারণি-৪১: ২০১৯ সালে দুদকের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন সংখ্যা

পরিদর্শনের ধরন	প্রধান কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয়
সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন	০৯	০৬
বিস্তারিত পরিদর্শন	০৯	০৭
মোট =	**১৮**	**১৩**

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

৮ম অধ্যায়

সুপারিশমালা

৮.১ ভূমিকা
৮.২ স্বাস্থ্য খাত
৮.৩ ওষুধ শিল্প
৮.৪ সড়কে যানবাহন ব্যবস্থাপনা
৮.৫ নকল, ভেজাল ও নিষিদ্ধ পণ্য সরবরাহ
৮.৬ নিষিদ্ধ পলিথিনের আগ্রাসন
৮.৭ নদী দখল
৮.৮ দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত ভূমি রেজিস্ট্রেশন সেবা
৮.৯ ইটভাটা স্থাপন সংক্রান্ত
৮.১০ দীর্ঘমেয়াদি নৈতিকতার বিকাশে বিএনসিসি কার্যক্রম
৮.১১ সরকারি পরিষেবায় মধ্যস্বত্বভোগী
৮.১২ ওয়াসা
৮.১৩ আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট সংক্রান্ত
৮.১৪ বাংলাদেশ রেলওয়ে
৮.১৫ স্থায়ী সিভিল সার্ভিস সংস্কার কমিশন গঠন
৮.১৬ বিবিধ সুপারিশমালা

সুপারিশমালা

৮.১ ভূমিকা

দেশের দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চা বিকাশের আইনি দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনের। এ আইনের নির্দেশনা অনুসারে কমিশন প্রতিবছর সরকারি পরিষেবায় বিদ্যমান হয়রানি, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে খাতভিত্তিক সুপারিশমালা প্রণয়ন করে থাকে। বিগত বছরের ন্যায় কমিশন এ বছরও স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। এ প্রেক্ষাপটে নিম্নে সন্নিবেশিত সুপারিশমালা মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করার নিমিত্ত সদয় উপস্থাপন করা হলো।

৮.২ স্বাস্থ্য খাত

উন্নত রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন বাংলাদেশ দেখছে তা বাস্তবায়নে নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এ দুটো বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতই গুরুত্বপূর্ণ। আবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কিছু বলা হলে, বিষয়টি যে শুধু চিকিৎসককেন্দ্রিক নয় তা আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় যেমন চিকিৎসকরা ভূমিকা রাখছেন পাশাপাশি নার্স, প্যারামেডিক, টেকনিশিয়ান, বিনিয়োগকারী, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ সম্পৃক্ত রয়েছেন। পরোক্ষভাবে বিশুদ্ধ খাদ্য, পানি, পরিবেশসহ নানা ইস্যুও সম্পৃক্ত হয়। তাই দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় একটি সমন্বিত কর্মকৌশল প্রণয়ন করা যেতে পারে।

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যু হ্রাস, শিশুমৃত্যু হ্রাসসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ঈর্ষণীয় সাফল্য প্রশংসার দাবি রাখে। আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি হচ্ছে 'প্রতিরোধ প্রতিষেধকের চেয়ে উত্তম' (Prevention is better than cure)। তাই বাস্তব কারণেই তরুণ প্রজন্মকে স্বাস্থ্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে নিবিড় আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ইস্যুতে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের দেশের মানুষকে পরিবেশগত কারণেও সংক্রামক রোগের প্রকোপসহ বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনাচারে সর্বস্তরে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যের নিবিড় বা বহুল প্রচার ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তবে স্বাস্থ্য শিক্ষা কিংবা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাসহ সবক্ষেত্রেই দুর্নীতির বিস্তার দেশের এ খাতের অনেক অর্জনকে ম্লান করছে। ২০১৯ সালে কমিশন স্বাস্থ্য সামগ্রী ক্রয়সহ স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বেশ কিছু দুর্নীতির ঘটনা উদঘাটন করে বেশ কিছু মামলা দায়ের করেছে। কমিশনের এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমেও দুর্নীতি প্রতিরোধে বেশকিছু অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কমিশন স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতির সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে এবং এসব উৎস নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ প্রণয়ন করছে। তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে সকল হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম বা দুর্নীতি হচ্ছে তা নয়। কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও টিমের পর্যবেক্ষণে বেশ কিছু হাসপাতাল বা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি বা অনিয়ম পাওয়া যায়।

৮.২.১ দুর্নীতির উৎস

(১) স্বাস্থ্য খাতের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি প্রভৃতিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান। ডাক্তারগণ সাধারণত প্রত্যন্ত এলাকায় থাকতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। সরকারি হাসপাতালে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণার্থী বাছাই প্রভৃতিতে কোন আদর্শ নীতিমালা অনুসৃত হয় না এবং স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক অর্থ আদায় করা হয় মর্মে জানা যায়;

(২) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকের কতিপয় কর্মচারী একই কর্মস্থলে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকার সুবাদে স্থানীয় দালালদের সমন্বয়ে সংঘবদ্ধ একটি চক্রে পরিণত হয়। সাধারণ রোগী বা তাদের স্বজনদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের নিকট থেকে বেআইনিভাবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে থাকে। সরকারি হাসপাতালের নির্ধারিত ফি ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ঝামেলা এড়িয়ে দ্রুত সেবা পাওয়ার আশায় রোগীরা অর্থের বিনিময়ে হাসপাতালের কর্মচারী বা দালালদের শরণাপন্ন হয়ে থাকে;

(৩) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ক্রয় কমিটিতে অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নিরপেক্ষ ও দক্ষ কর্মকর্তা সংযুক্ত না থাকায় অতি সহজেই সরকারি টাকা আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ক্রয় কমিটির কার্যক্রমে সরকারের যথাযথ নজরদারি না থাকায় ঔষধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অন্যান্য পণ্য ক্রয়ে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে অনেক অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আঁতাত করে সরকারি টাকা ভাগ-বাটোয়ারা হয় মর্মে অভিযোগ রয়েছে;

(৪) উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট চালানোর জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ না দিয়েই যন্ত্রপাতি সরবরাহ ক্রয় করা হয়, যা দীর্ঘকাল অব্যবহৃত থেকে নষ্ট হয়ে যায়। কোথাও কোথাও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও মেরামত দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে সরবরাহ বা মেরামত করা হয় না, বরঞ্চ সমপরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করা হয়;

(৫) দেশের অনেক সরকারি হাসপাতালে সংঘবদ্ধ দালাল চক্র সক্রিয় থাকে। এদের কাজ হলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা অসহায় গরিব রোগীদের উন্নত চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। বিনিময়ে ওই সকল হাসপাতাল থেকে তারা একটি কমিশন পেয়ে থাকেন। ফলে গরিব রোগী কম মূল্যে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন;

(৬) যথাযথ নজরদারি না থাকায় হাসপাতালগুলোতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ওষুধ থাকা সত্ত্বেও রোগীদের প্রদান করা হয় না। এ সকল ওষুধ কালোবাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়; কিন্তু রেজিস্টারে হিসাব মিলিয়ে রাখা হয়;

(৭) সাধারণত সমাজের এক শ্রেণির প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যথাযথ সরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন করে থাকেন। তারা নানা উপায়ে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকসহ কর্মচারীদের প্রভাবিত করে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রোগী পাঠাতে বলে। বিনিময়ে কমিশন দিয়ে থাকে। ফলে সাধারণ রোগীরা অযথা আর্থিক দুর্ভোগের শিকার হয়। গরিব রোগীরা বিনামূল্যে যথাযথ চিকিৎসা সেবা হতে বঞ্চিত হন;

(৮) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে মেধা যাচাই না করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয় মর্মে জানা যায়;

(৯) অনৈতিক প্রভাবে নিম্নমানের/অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি কেনা হয়;

(১০) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে Procurement-CMSD তে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম/দুর্নীতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হয়;

(১১) বাংলাদেশে বিদ্যমান ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স কোম্পানিসমূহের মধ্যে কিছু কিছু কোম্পানি অথবা কোম্পানি নামধারী নকল ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নমানের ও নকল ওষুধ প্রস্তুত করে থাকে। এসব কোম্পানি বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে চিকিৎসকদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে তাদের উৎপাদিত নিম্নমানের ওষুধ প্রেসক্রাইব করানোর ব্যবস্থা নেয়। এসব ওষুধ খেয়ে রোগী সুস্থ না হওয়ায় পুনরায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং চিকিৎসা খরচ কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

৮.২.২ দুর্নীতি প্রতিরোধে সুপারিশমালা

(১) দেশের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এমন উন্মুক্ত স্থানে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের বিধান নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিদিন কী কী ওষুধ স্টকে আছে তা প্রদর্শন করা;

(২) ওষুধ ও Medical Equipments ক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং অনিয়ম বন্ধ করার জন্য ক্রয় কমিটিতে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। জনবল না থাকলে Equipment ক্রয় না করা। ওষুধ ও Medical Equipments ক্রয়ের ক্ষেত্রে ইজিপিতে টেন্ডার আহ্বান এবং পিপিআর এর বিধানের যাতে ব্যত্যয় না ঘটে তা যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করা;

(৩) হাসপাতাল পর্যায়ে যন্ত্রপাতি Receive Committee-তে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত হয়ে যন্ত্রপাতি গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ। যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে দক্ষ জনবল নিয়োগ দিয়েই যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার বিধান করা ;

(৪) প্রতিটি হাসপাতালে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ওষুধের তালিকা এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ডায়াগনসিস পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য তালিকা জনসমক্ষে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া, হাসপাতালে বিদ্যমান Medical Equipment সমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থাকরণ। এক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক স্টক রেজিস্টার এর সাথে একটি ডিস্প্লে যুক্ত করে দেয়া যেতে পারে। বড় হাসপাতাল থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য হাসপাতালে ই-রেজিস্টার চালু করা যেতে পারে;

(৫) বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে সংঘবদ্ধ দালালচক্র যাতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা অসহায় গরিব রোগীদেরকে উন্নত চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে না যেতে পারে সেজন্য প্রতিটি হাসপাতালে কঠোর নজরদারির লক্ষ্যে একটি ভিজিল্যান্স/মনিটরিং টিম গঠন করাসহ সিসিটিভি (CCTV) তদারকি জোরদার করা যেতে পারে এবং অপরাধী সনাক্ত হলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

(৬) দেশের জেলা উপজেলাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে যততত্র অনেক প্রাইভেট ক্লিনিক/হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে উঠেছে। এরমধ্যে অনেক প্রাইভেট ক্লিনিক/হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের অনুমোদন নেই। অনেক হাসপাতালে প্রয়োজন অনুপাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ডবয় এবং প্রয়োজনীয় মেডিকেল ইকুইপমেন্ট নেই। অনেক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা ল্যাব টেকনিশিয়ান নেই। অনেক সময় সনদবিহীন টেকনিশিয়ান দিয়ে প্যাথলজিক্যাল টেস্ট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়। এতে ভুল রিপোর্টের কারণে রোগীর ভুল চিকিৎসা হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রতিটি জেলায় সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে একটি সার্ভিল্যান্স টিম গঠন করা যেতে পারে। টিম এরূপ ক্লিনিক/ হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর তালিকা করবে এবং এগুলো বন্ধ করার সুপারিশ ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে;

(৭) ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপন ও অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্থায়ী চিকিৎসক/কর্মচারী ও কার্যনির্বাহী কমিটি ইত্যাদি রয়েছে কিনা এসব বিষয় নিশ্চিত করতে হবে;

(৮) স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষার কার্যক্রমে জেলা/উপজেলা প্রশাসনসহ অন্যান্য নির্বাহী দপ্তরকে অবহিত রাখা এবং বিল ভাউচার সিভিল সার্জনসহ কমপক্ষে দুজন কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই-বাছাই নিশ্চিত করার বিধান চালু করা;

(৯) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নকল ওষুধ কারখানার মাধ্যমে নিম্নমানের ওষুধ তৈরি হয়, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এ সকল নকল ওষুধ কারখানা বন্ধের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সারভিল্যান্স টিম গঠন করা প্রয়োজন।

টিমের অভিযানকালে কোনো নকল ওষুধ কারখানার সন্ধান পাওয়া গেলে তা তাৎক্ষণিক সিলগালা করে জেল জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে চিকিৎসকদের একটি সুনির্দিষ্ট বদলি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এরূপ বদলি নীতিমালায় কোনো চিকিৎসকের একই কর্মস্থলে চাকরির মেয়াদ ০৩ (তিন) বৎসর হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার বদলি কার্যকর হবে। প্রত্যন্ত এলাকায় পদায়নকৃত চিকিৎসকদের জন্য বিভিন্ন প্রণোদনার বিধান করা যেতে পারে। প্রত্যেক স্টেশনে চিকিৎসকদের অবস্থান বাধ্যতামূলক করা;

(১১) হাসপাতালের রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে অটোমেশন এর আওতায় এনে আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে নিয়মিতভাবে জমা প্রদান নিশ্চিত করা;

(১২) প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন অবশ্যই পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে হবে অথবা কম্পিউটার টাইপ করে রোগীর হাতে দিতে হবে। ডাক্তারদের প্রাইভেট প্রাকটিসের সময় চিকিৎসার ফি নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এ বিষয়ে নীতিমালা করে পদক্রম অনুযায়ী ডাক্তারদের যৌক্তিক ফি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রথমবার ফি নেওয়ার পর রিপোর্ট দেখানোর সময় আবার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিতে হয়, যা অনুচিত। নীতিমালা করে রিপোর্ট দেখানোর ফি নেওয়া বন্ধকরণ;

(১৩) বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির (Representative) মাধ্যমে কতিপয় চিকিৎসক প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সময় উপঢৌকন গ্রহণ করে থাকেন। ফলে তারা অনেক সময় ব্যবস্থাপত্রে ওই সকল কোম্পানির নিম্নমানের ওষুধ লিখে থাকেন। এতে চিকিৎসা সেবার মান নিম্নমুখী হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাইভেট ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর প্যাড চিকিৎসকদের নিকট থাকে। তারা কমিশনের বিনিময়ে রোগীদেরকে বিভিন্ন ল্যাব/প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা ওই সকল ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো হতে করানোর পরামর্শ প্রদান করেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে। এটা বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১৪) বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য মেলার আয়োজনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

(১৫) চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন ও অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য বিমা চালুকরণ এবং বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণ;

(১৬) প্রশাসনিক সুবিধার্থে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভেঙে স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর নামে পৃথক দুটো অধিদপ্তর চালুকরণ;

(১৭) চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশেষত বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ, প্যারামেডিক ইনস্টিটিউটসমূহের মানোন্নয়ন;

(১৮) একজন নির্দিষ্ট ডাক্তার দৈনিক কতজন রোগী দেখবেন এবং তার ফি কত হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা;

(১৯) চিকিৎসকগণের (সরকারি/বেসরকারি) পদোন্নতির জন্য সরকারি চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে পিএসসি এবং বেসরকারি চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য) এবং পিএসসির প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সুপারিশ প্রদান করা যেতে পারে;

(২০) চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রে ওষুধের Trade নাম না লিখে জেনেরিক নাম লেখার পরামর্শ বিবেচনা করা যেতে পারে ;

(২১) ইন্টার্নশিপ এক বছর থেকে বাড়িয়ে দুই বছর করা এবং বর্ধিত এক বছর উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে থাকা বাধ্যতামূলক করা; উপজেলা পর্যায়ে কাজ না করলে উচ্চ শিক্ষার অনুমতি না দেওয়া;

(২২) সকল হাসপাতালে জরুরি হটলাইন, পরামর্শ ও অভিযোগ কেন্দ্র এবং যোগাযোগের সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা রাখা;

(২৩) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র/সিভিল সার্জন অফিস পরিদর্শনকালে সরকারি বরাদ্দ বহির্ভূত আপ্যায়ন প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করা;

(২৪) চিকিৎসকদের জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর নৈতিকতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা;

(২৫) বাংলাদেশে বিরাজমান ওষুধ উৎপাদন, বিতরণ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কার্যকর নজরদারির লক্ষ্যে এবং ভবিষ্যতে ওষধের মান বজায় রাখার জন্য একটি ওষুধ প্রস্তুতকারী কর্তৃক একইসাথে একাধিক উৎস থেকে সংগৃহীত কাঁচামাল দ্বারা ওষুধ উৎপাদন নিষেধ করার সুপারিশ করা হলো।

৮.৩ ওষুধ শিল্প

৮.৩.১ সম্ভাব্য দুর্নীতির উৎস

ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বাংলাদেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষ, যারা ওষুধ উৎপাদন, বিক্রয়, বিতরণ, আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ওষুধের কারখানা স্থাপন, ওষুধের কাঁচামাল ও ওষুধ আমদানি ও প্রস্তুতকরণ, বিক্রয়, ওষুধের মোড়ক/প্যাকেট প্রস্তুত ও ব্যবহার, ওষুধের রেসিপি, লিটারেচার, ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ ও নমুনা পরীক্ষা, ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন এবং ওষুধের মজুদ সংরক্ষণ কাজে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদন বা লাইসেন্স এর প্রয়োজন হয়। সেবা প্রার্থীগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাযথ কাগজপত্র দাখিল না করেই দ্রুত সেবাটি পেতে চান। এই সুযোগে ওষুধ প্রশাসন খাতে জড়িত কতিপয় অসৎ কর্মচারী খরচের বিভিন্ন প্যাকেজ অফার করে, যা নির্ধারিত ফি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে সেবা গ্রহীতাগণের হয়রানি এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের দুর্নীতির অন্যতম উৎস হচ্ছে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির মান সনদ গ্রহণ প্রক্রিয়া। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাণাধীন ল্যাবরেটরিতে সমগ্র দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সনদ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ওষুধের মান সঠিক রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করাই ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরির মূল কাজ। মান পরীক্ষা করার পর মানের সনদপত্র দেওয়া হয়। কোন কোম্পানি কী ওষুধ তৈরি করছে, কোনটার মান কতটা স্টান্ডার্ড, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী হচ্ছে কি না এই বিষয়গুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সক্ষমতার যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনি অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির অন্যতম উৎসও এগুলো। অনেক নাম সর্বস্ব কোম্পানি আছে যাদের পণ্য পরীক্ষায় মান উত্তীর্ণ হয় না, কিন্তু সেগুলোকেও মানসম্মত বলে সনদ দেয়া হয় মর্মে জানা যায়। ফলে বাজারে নিম্নমানের ওষুধ বিক্রি হওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এসব নিম্নমানের ওষুধ জনস্বাস্থ্যের জন্য বিশাল হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশে অ্যালোপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারী অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান মানসম্মতভাবে ওষুধ তৈরি করছে কি না তা সরেজমিনে পরিদর্শন করার কথা রয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের। অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান বিধি-বিধান অনুসরণ করে পরিদর্শন করা হয় না। এসব প্রতিষ্ঠান পদ্ধতিগতভাবে পরিদর্শন না করে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান করে মর্মে অভিযোগ আছে। ফলে নিম্নমানের, নকল ও ভেজাল ওষুধের সরবরাহ বন্ধ হচ্ছে না।

কোনো একটি ওষুধ প্রস্তুতের পর বাজারে বিক্রি করতে হলে আগে সেই ওষুধের নমুনা ওষুধ প্রশাসনে জমা দিয়ে নতুন ব্যাচ হিসেবে অনুমোদন নিতে হয়। প্রতি বছর একেকটি ওষুধ কোম্পানি এক থেকে তিন-চারটি ব্যাচ ওষুধ বিক্রির জন্য বাজারে ছেড়ে থাকে। নিয়ম হচ্ছে আগে ওষুধের ব্যাচ অনুমোদন নিয়ে তারপর বাজারে ছাড়তে হবে। কিন্তু কোম্পানিগুলো ওষুধ বিক্রি শুরু করে তারপর ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে ফাইল পাঠিয়ে দেয়, প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা ফাইলে সই করে দেয়। এখানে ওষুধ প্রশাসনের কঠোর অবস্থান দেখা যায় না। প্রতিষ্ঠানটির কিছু কর্মকর্তা আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে ব্যাচের ওষুধের অনুমোদন দিয়ে থাকে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়।

দেশে প্রায় আড়াই লাখ ফার্মেসি রয়েছে। প্রতি বছর এসব ফার্মেসি পরিদর্শন করার কথা থাকলেও ৫০ শতাংশের বেশি ফার্মেসি থাকে পরিদর্শনের বাইরে। যারা দায়িত্বে আছেন তারা পরিদর্শন কার্যক্রম ঠিকমতো না করে ফার্মেসি মালিকদের কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ে থাকেন বলে প্রায়ই অভিযোগ আসে। আর এই সুযোগে ফার্মেসিগুলোতে আমদানি নিষিদ্ধ চোরাই পথে আসা ওষুধ, নিম্নমানের ওষুধ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি হচ্ছে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর নকল ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রির বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জেল-জরিমানার ব্যবস্থা নিচ্ছে। তারপরও নকল-ভেজাল ও মানহীন ওষুধের জোগান বন্ধ করা যাচ্ছে না। ওষুধ ব্যবসায়ী সমিতির ব্যানারে কতিপয় ব্যবসায়ী নেতা এবং ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তার যোগসাজশে অনৈতিক সিন্ডিকেট এসব দুর্নীতির সাথে জড়িত রয়েছে মর্মে জানা যায়।

নকল-ভেজাল ও মানহীন ওষুধ উৎপাদনের মূলে রয়েছে খোলাবাজারে বিক্রি হওয়া ওষুধের কাঁচামাল। ওষুধ প্রশাসনের অনুমোদন পাওয়া কোম্পানিই কেবল বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে পারে। এসব কাঁচামাল খোলাবাজারে বিক্রির সুযোগ নেই। কিন্তু অনেক ওষুধ কোম্পানি চাহিদার তুলনায় অধিক পরিমাণে কাঁচামাল আমদানি করে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ীরা এসব অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত মর্মে জানা যায়।

৮.৩.২ সুপারিশ

(১) ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমেও বিকল্প পরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কোনো অবস্থাতেই মান পরীক্ষা না করে ওষুধ বাজারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। এ জাতীয় ওষুধ কোম্পানি বা মালিকদের চিহ্নিত করে কারখানা বন্ধসহ কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

(২) সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ ওষুধ কারখানা নিয়মিত পরিদর্শন করবেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিএমএইচ-এর প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। কোনো অবস্থাতেই ওষুধ প্রশাসনের অনুমোদন ব্যতীত নতুন ব্যাচের ওষুধ বাজারে বিপণন করা যাবে না।

(৩) ফার্মেসিসমূহ মনিটরিংয়ের জন্য ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পাশাপাশি জেলা, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বাজার মনিটরিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা যেতে পারে।

(৪) খোলাবাজারে ওষুধের কাঁচামাল বিক্রি হয় নিষিদ্ধ করতে হবে অথবা কাঁচামালের মান যাচাই করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে সীমিতভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কাস্টমস বিভাগকেও সচেতন থাকতে হবে।

(৫) চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন ফার্মেসী এন্টিবায়োটিক ঘুমের ওষুধ বা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদনবিহীন কোন ওষুধ বিক্রয় করতে পারবেন না। বিধায় এ বিষয়ে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.৪ সড়কে যানবাহন ব্যবস্থাপনা

দেশের যানবাহন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি-স্বেচ্ছাচারিতা-সিন্ডিকেট এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক এবং নির্ধারিত অর্থের ভাগ-বাটোয়ারার তথ্যসংবলিত অভিযোগ প্রায়ই দুদকে আসে। শুধু দুদক নয় গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও এসব অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়। দুদকের যেসব ইউনিট ভার্চুয়াল জগতের তথ্য সংগ্রহ করেন তারাও বিষয়গুলো কমিশনের গোচরীভূত করেন। দেশে সড়ক দুর্ঘটনা মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ বলা যেতে পারে। এসব অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপকতা তৃণমূল থেকে জালের মতো বিস্তৃত। এসব ক্ষেত্রে কতিপয় সম্ভাব্য দুর্নীতির উৎস এমন হতে পারে যেমন-অবৈধ যানবাহন চলাচলে অনৈতিক আর্থিক লেন-দেন, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল, লাইসেন্সবিহীন চালক, চালকদের লাইসেন্স ইস্যু বিশেষ করে ভারী যানবাহন চালানোর লাইসেন্স ইস্যু ইত্যাদি। মনুষ্য সৃষ্ট কারণে সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু অসংখ্য পরিবারকে করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। ব্যক্তি, পরিবার , সমাজ সবাই সড়কে নিজেকে বিপন্ন মনে করে।

৮.৪.১ সুপারিশ

(১) দেশের সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে সড়কে অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল। বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়, দেশে প্রায় ১০ লাখের বেশি নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজি-বাইকসহ বিভিন্ন ছোট যানবাহন সম্পূর্ণ অবৈধভাবে চলাচল করছে। এগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিবন্ধন নেই, কারিগরিভাবে ঠিক আছে কি না তা যাচাইও করা হয়নি। সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে জানা যায়, এ জাতীয় অবৈধ যানবাহন চলাচলের জন্য অবৈধ আর্থিক লেন-দেন হয়ে থাকে। এ বাস্তবতায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে কেবল স্থানীয় সড়কে এ জাতীয় যানবাহন অস্থায়ী ভিত্তিতে চলাচল করতে পারে। তবে জাতীয় বা আঞ্চলিক মহাসড়কে এসব যানবাহ চলাচল নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার যেমন ইউনিয়ন পরিষদ , পৌরসভা স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের আয়তন এবং সড়কের দৈর্ঘের উপর ভিত্তি করে সাময়িকভাবে এদের লাইসেন্স প্রদান করতে পারে। স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের বাইরে এসব যানবাহনের চলাচল করার সুযোগ থাকবে না। এসব যানবাহন আমদানি নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। যাতে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে এসব যানবাহনের ব্যবহার কমে আসে।

(২) এছাড়া ভারী যানবাহনসহ যেসব যানবাহনের ফিটনেস সনদ হালনাগাদ নেই সেগুলো কোনো অবস্থাতেই সড়ক-মহাসড়কে চলতে পারে না। প্রয়োজনে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এসব যানবাহন স্ক্র্যাপ করা যেতে পারে।

(৩) সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হচ্ছে চালকের বেপরোয়া মনোভাব, যানবাহনের ফিটনেস ত্রুটি, সড়কের নির্মাণ ত্রুটি ইত্যাদি। এসবের পিছনে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচারের অভাব, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাঁদাবাজি-অনিয়ম-দুর্নীতি, বিশেষ করে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম-দুর্নীতি। চালকদের লাইসেন্স প্রদানের স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ সরকারি চালকদের ন্যায় বেসরকারি পর্যায়ে চালকদের নিয়োগপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

(৪) চালকদের কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করা। তাদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। চালক বা শ্রমিকদের ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে অনুপার্জিত আয় ভোগ করার পথ রুদ্ধ করা। যদিও এখাতে যারা অনুপার্জিত আয় ভোগ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে, এমন দু-একজনের বিষয়ে দুদক অনুসন্ধান করছে। দুদক মনে করে এসব ক্ষেত্রে প্রতিষেধকের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। কারণ এ সমস্যা দীর্ঘদিনের তাই এক্ষেত্রে অনুপার্জিত আয়ের পথ রুদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

(৫) সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সড়কে যেসব স্থানে সাইন ও সংকেত নেই সেসব স্থানে দ্রুত সাইন ও সংকেতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকসমূহ চিহ্নিত করে তা সোজা করার ব্যবস্থা নেওয়। ভারী যানবাহনসহ সকল যানবাহনের সকল প্রকার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা। যানবাহনের লাইসেন্স প্রদানানকারী সংস্থাটিকে সুনির্দিষ্ট টাইম-ফ্রেমে সেবা (লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন , রুট পারমিটসহ অন্যান্য) প্রদানে জবাবদিহি করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তাদের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

৮.৫ নকল, ভেজাল ও নিষিদ্ধ পণ্য সরবরাহ

দেশের বাজারে ভেজাল, নকল ও নিষিদ্ধ পণ্যের সরবরাহ উদ্বেগজনক। এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য, দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য এমনকি দেশের ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এসব পণ্য যাতে বাজারে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আইন-বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সবই রয়েছে, তারপরও কেন এ জাতীয় পণ্যের সরবরাহ বন্ধ করা যাচ্ছে না ? এর পিছনে রয়েছে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের সক্ষমতার অভাব, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, অতি মুনাফালোভী ব্যবসা, সর্বোপরি অনিয়ম-দুর্নীতি ইত্যাদি । বাজারে ছাড়া হচ্ছে এমন মানহীন পণ্যের মধ্যে প্রসাধনী, শিশু খাদ্য, ফুড সাপ্লিমেন্ট, সিগারেট, মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজারে বিক্রি হওয়া প্রসাধনীর একটি বড় অংশই নকল। এগুলো ক্ষতিকর রাসায়নিক ও অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরি এসব প্রসাধনী ব্যবহার করে অনেকে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এসব মানহীন পণ্য দেশে ক্যান্সারসহ নানাবিধ রোগ-ব্যাধি ছড়াচ্ছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

৮.৫.১ সুপারিশ

(১) এ জাতীয় মানহীন পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে জড়িত অপরাধীদের চিহ্নিত করে অপরাধের ব্যাপকতা নিরূপণপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। এছাড়া বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা যেতে পারে।

(২) দেশের বন্দরসমূহ রাষ্ট্রের গেটকিপারের ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। আর বন্দরের কাস্টমস ইউনিটকে বলা হয় 'গেটকিপার অব দ্য নেশন'। কাস্টমস বিভাগকেই দেশের বাণিজ্য নীতি বাস্তবায়ন, রপ্তানি উন্নয়ন, নিষিদ্ধ এবং ক্ষতিকর পণ্যের ছাড় করতে না দেওয়াসহ পণ্য ছাড়করণে মুখ্য দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিএসটিআই প্রতিনিধি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সিএন্ডএফ এজেন্টদেরও ভূমিকা রযেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি অনিয়মের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ জাতীয় পণ্য দেশে প্রবেশ করে। তাই বন্দরসমূহের সমন্বিত মনিটরিংয়ের জন্য যৌথ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রচলন করা যেতে পারে। যৌথ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিষয়ে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান প্রচলন করা যেতে পারে।

(৩) বাজারে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে অন্যতম দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই। বাজারের পণ্য সংগ্রহ করে নিয়মিত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে পণ্যের মান মনিটরিং করার দায়িত্ব পালনে এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে অধিকাংশ মানুষই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। বাজারে পণ্যের মান নিশ্চিত করে মানহীন পণ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও বিপণনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে এসব তথ্য নিয়মিত তাদের ওয়েবসাইটে upload করা যেতে পারে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমের মধ্যে পণ্যে বিএসটিআই-এর অনুমোদন প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও পণ্যেরে মান নির্ণয় ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে। বিএসটিআইয়ের কার্যক্রমে বিসিএসআইআর বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ-এর প্রতিনিধি, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটিকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। বাজারে এমন খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় যেখানে BSTI এর সিল থাকে না, পণ্যের কৌটায় বাংলা বা ইংরেজি বাদে অন্য ভাষায় Nutrition Fact বা Ingredients লেখা থাকে ফলে ভোক্তা কি ক্রয় করছেন তা জানতে পারেন না। BSTI এ বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে পারে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এখনই এসকল পণ্য বাজার থেকে তুলে নেয়া যেতে পারে।

৮.৬ নিষিদ্ধ পলিথিনের আগ্রাসন

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, নগরীর জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ, ভূমির উর্বরতা হ্রাসসহ নানা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের পণ্য হচ্ছে পলিথিন। দেশে আইন করে এই পণ্য নিষিদ্ধ করা হয়। তারপরও বাজারে এ পণ্যের সর্বত্র উপস্থিতি। এই নিষিদ্ধ পণ্যের প্রভাবেই দেশের পাটশিল্প ক্ষতির সম্মুখীন। আবার পলিথিন রিসাইকেল করার কোনো সিস্টেমও দেশে নেই। সব মিলিয়ে পলিথিন দেশের জন্য হুমকি। এসব নিষিদ্ধ পলিথিন পণ্যের নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোও নির্বিকার। পৃথিবীর অনেক দেশেই পলিথিন নিষিদ্ধ। এসব পলিথিন উৎপাদনকারী অসাধুব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের কোনো কোনো কর্মকর্তাকে অনৈতিক সুবিধা দিয়ে নির্বিঘ্নে তাদের অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে শোনা যায়।

৮.৬.১ সুপারিশ

উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে পলিথিনের উৎপাদন-বিপণন সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য সমন্বিত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উৎপাদনের উৎসমূলে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা যেতে পারে।

৮.৭ নদী দখল

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা আজ উদ্বেগজনকভাবে হুমকির মুখোমুখি। প্রাকৃতিক, আন্তর্জাতিক এবং কতিপয় সর্বগ্রাসী নদী দখলদারের কারণেই দেশের নদীসমূহ আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত 'ন্যাশনাল রিভার কনজারভেশন কমিশন' এর রিপোর্ট অনুসারে দেশের ৬৪টি জেলার ১৩৯টি নদী ব্যাপকভাবে দখল করা হয়েছে। কেবল ঢাকার বাইরে ৪৯,১৬২ জন নদী দখলদারকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ অথবা আত্মসাতের সহযোগিতা দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধ। কমিশন ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় সরকারি খাস জমি দখলদারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কমিশনের প্রতিরোধমূলক বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় সরকারি সম্পত্তি স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় দখলমুক্ত করা হচ্ছে।

৮.৭.১ সুপারিশ

প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসকগণ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে যেসব নদী দখল হয়েছে-তা উচ্ছেদের মাধ্যমে নদীগুলোকে দখলমুক্ত (Time Bound) করবেন এবং দখলকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রতিটি জেলার জেলাপ্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংরক্ষণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে প্রতিবেদনের অনুলিপি দুদকে প্রেরণ করতে পারে। সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জেলাপ্রশাসকগণ দুর্নীতি প্রতিরোধে তাদের কার্যকর ভূমিকা রাখবেন মর্মে কমিশন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করে। কমিশন ইতোমধ্যে সরকারি খাস জমি,অর্পিত সম্পত্তি দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবে এসব সম্পত্তি রক্ষা করার আইনি দায়িত্ব জেলা প্রশাসকদের। তাই দেশের প্রতিটি জেলায় যেসব সরকারি সম্পত্তি রয়েছে তা সীমানা নির্ধারণপূর্বক সাইনবোর্ড স্থাপন করার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.৮ দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত ভূমি রেজিস্ট্রেশন সেবা

এই উপমহাদেশে ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগের ইতিহাস বেশ পুরাতন। ব্রিটিশদের হাত ধরে তৎকালীন ভারতবর্ষে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সূচনা। পরবর্তীকালে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে সর্ব ভারতীয় আইন হিসাবে ১৯০৮ সালের ১৬ নম্বর আইন জারি করা হয় যা বর্তমান রেজিস্ট্রেশন আইন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর আইনটি সংবিধানের ১৪৯ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে আমাদের দেশে বহাল রয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও জনগুরুত্ব সম্পন্ন এই বিভাগটি সময়ের সাথে সাথে যুগোপযোগী না হওয়ায় একাধারে জনগণ স্বচ্ছ, হয়রানিমুক্ত ও মানসম্পন্ন সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন; অন্যদিকে এই বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও চাকরিতে জব-স্যাটিস্‌ফেকশন না থাকায় ভালো সেবা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিভাগটি প্রতি অর্থবছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগকে ঢেলে সাজানোর বিকল্প নেই।

৮.৮.১ প্রচলিত ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ বহুদূর এগিয়ে গেলেও ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি এখনো মান্ধাতা আমলের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেই পরিচালিত হচ্ছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে দলিল লেখকগণ হাতে বা কম্পিউটার টাইপের মাধ্যমে দলিল প্রস্তুত করার পর সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট দলিলের দাতা/গ্রহীতা দলিলটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপস্থাপন করেন। সাব-রেজিস্ট্রার উপস্থাপিত কাগজপত্র স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সঠিক মনে করলে পক্ষ/পক্ষগণের শুনানি গ্রহণ করে দলিলটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য গ্রহণ করেন।

দলিলটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য গ্রহণ করার পর দলিলের ক্রমানুযায়ী নকলনবীশগণ বালাম বইতে হাতে লিখে দলিলের হুবহু নকল প্রস্তুত করেন। বালাম বইতে কপি ও সূচির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মূল দলিলটি সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ফেরৎ প্রদান করা হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে অফিস ভেদে ২ থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত সময় ব্যয় হয়। এই দীর্ঘ সময় মূল দলিল রেজিস্ট্রি অফিসের হেফাজতে থাকে। অদক্ষ কর্মচারীদের হাতে লিখিত হুবহু নকল প্রস্তুতের সময় বালাম বইতে ভুল লেখার ঝুঁকি থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিকভাবে সেই ভুল দৃষ্টিগোচর না হলে ভবিষ্যতে মামলা-মোকদ্দমার উদ্ভব হয়।

৮.৮.২ প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির দুর্বলতা

(০১) মূল দলিল হাতে লিখে বালাম বইতে সংরক্ষণ করা হয়। জনবল ও বালাম বইয়ের অপ্রতুলতার কারণে মূল দলিল ফেরত পেতে ক্ষেত্র ভেদে ২ থেকে ৪/৫ বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। দীর্ঘ সময় আন্-কপিড দলিল অফিসে সংরক্ষিত থাকায় দলিলের পৃষ্ঠা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে দাগ, খতিয়ান, জমির পরিমাণ ইত্যাদি পরিবর্তনের ঝুঁকি থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল দলিল খোয়া যাওয়ারও ঝুঁকি থাকে।

(০২) রেজিস্ট্রি অফিসসমূহে ROR (Record of Rights) এর কপি/নামজারির কপি সংরক্ষিত না থাকায় জাল মালিকানার পর্চা ও নামজারি উপস্থাপন করে জাল দলিল রেজিস্ট্রেশনের ঝুঁকি থাকছে।

(০৩) সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ROR (Record of Rights) এর কপি না থাকায় উচ্চ মূল্যের ভূমির শ্রেণি গোপন করে অপেক্ষাকৃত নিম্ন মূল্যের শ্রেণি দলিলে লিপিবদ্ধ করে জাল পর্চা ও দাখিলা উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রতারক চক্র সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

(০৪) নির্বাচন কমিশনের সাথে রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের কানেক্টিভিটি না থাকায় অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জাল জাতীয় পরিচয়পত্র উপস্থাপন করে ভূয়া ব্যক্তির মাধ্যমে জাল দলিল রেজিস্ট্রির প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে জনগণ প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

(০৫) রেজিস্ট্রি অফিসে তথ্যসমূহের কম্পিউটার ডাটা-বেইজ না থাকায় দুদক বা অন্য কোনো সংস্থা বা প্রত্যাশী ব্যক্তি কোনো জমির মালিকানা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সূচি বা বালাম বই তল্লাশ করে প্রকৃত তথ্য খুঁজে পাওয়া সময়সাপেক্ষ ও কঠিন।

(০৬) বালাম বই থেকে হাতে লেখা সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করা হয়। এই পদ্ধতি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। অনেক ক্ষেত্রেই কর্মচারীদের অসতর্কতার জন্য ভুল তথ্য সরবরাহের সম্ভাবনা থেকে যায়।

(০৭) রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য বালাম ও সূচি বইয়ের একটি মাত্র কপি প্রস্তুত করা হয়। কালের বিবর্তনে বালাম বই ও সূচি বইয়ের পৃষ্ঠা নষ্ট হওয়া বা অস্পষ্ট হওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেকর্ডরুম থেকে বালাম বই চুরি হওয়া বা রেকর্ডরুমের বালাম বইয়ের পাতা ছেঁড়া ও ঘষা-মাজা করে দলিলের তথ্য পরিবর্তনের মতো দুর্ঘটনাও ঘটে । ফলে স্থায়ীভাবে রেকর্ডপত্র ধ্বংস হয়। পুরাতন বালাম বই ও সূচি বই পুনর্গঠনের বিধান থাকলেও দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের অভাবে তা সব সময় সম্ভব হয় না।

৮.৮.৩ ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির ডিজিটালাইজেশন ও আধুনিকায়ন

ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে জনবান্ধব ও দুর্নীতিমুক্ত করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশন ও আধুনিকায়ন করা। ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি ডিজিটাইজেশন করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন :

(০১) রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তরে দেশের সকল এলাকার জমির শ্রেণি-ভিত্তিক মূল্য তালিকা, বিভিন্ন ধরনের দলিলের জন্য অনুমোদিত ফরমেট, বিভিন্ন প্রকার দলিলের ফিসের হার ইত্যাদি সংবলিত একটি ওয়েব সাইট থাকবে। ওয়েব সাইট থেকে যে কোনো ব্যক্তি দেশের যে কোনো এলাকার জমির বাজার মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন ফিস সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। ওয়েব সাইটে বিভিন্ন ধরনের দলিলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফরমেট থাকলে সারা দেশে উক্ত ফরমেট অনুযায়ী দলিল প্রস্তুত করা সম্ভব হবে , ফলে দেশের সকল এলাকার দলিলের ভাষা ও গঠনে সাযুজ্য পরিলক্ষিত হবে। ওয়েবসাইটে ওয়েব ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে যে কোনো জমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রযোজ্য ফি ও করসমূহের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরবরাহের সুযোগ থাকবে।

(০২) ওয়েবসাইট থেকে দলিলের ফরমেট ডাইনলোড করে যে কোনো ব্যক্তি নিজে বা অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে দলিল প্রস্তুত করতে পারবেন। প্রস্তুতকৃত দলিল স্ট্যাম্প পেপারে প্রিন্ট করে হার্ডকপি এবং একই সাথে সফ্টকপি সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপস্থাপন করতে পারবেন। ফলে কোন মধ্যস্বত্বভোগীর উপস্থিতির সুযোগ থাকবে না।

(০৩) দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রযোজ্য ফি ও কর বাবদ কী পরিমাণ অর্থ প্রদেয় তা ওয়েব ক্যালকুলেটর এসেসমেন্ট স্লিপের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরবরাহ করবে। সরবরাহকৃত এসেসমেন্ট স্লিপ অনুযায়ী পক্ষগণ স্বয়ং যে কোনো সোনালী ব্যাংক/অন্য কোনো তফসিলি ব্যাংকের শাখা থেকে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে প্রযোজ্য ফি ও কর পরিশোধ করতে পারবেন।

(০৪) দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপস্থাপনের পর দলিলের সাথে উপস্থাপিত জমির মালিকানা সংবলিত কাগজপত্র যেমন ROR (Record of Rights) বা নামজারির কপি ভূমি জরিপ অধিদপ্তর বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইন যাচাইয়ের সুযোগ থাকবে। অনলাইনে ROR/নামজারি যাচাই করে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর সাব-রেজিস্ট্রার পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(০৫) প্রতিটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে দলিলের দাতা, গ্রহীতা, স্বাক্ষী ও শনাক্তকারীর পরিচয়পত্র যাচাই করার সুযোগ থাকবে।

(০৬) প্রতিটি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সাথে অন লাইনে সোনালী ব্যাংক/অন্য কোনো তফসিলি ব্যাংকের কানেক্টিভিটি থাকবে। দলিল দাখিলের পর সাব-রেজিস্ট্রার তাৎক্ষণিকভাবে দলিলের জন্য প্রযোজ্য সরকারি রাজস্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দানের স্লিপটি অনলাইন ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত হবেন।

(০৭) মূল দলিল বালাম বইতে হাতে লিখে কপি করার পরিবর্তে স্ক্যান করে ইউনিক আইডিসহ সার্ভারে ডিজিটালি সংরক্ষণ করা হবে। দলিলের দাতা, গ্রহীতা ও শনাক্তকারীর ডিজিটাল ছবি গ্রহণ করে সার্ভারে মূল দলিলের স্ক্যান কপির সাথে সংরক্ষণ করা হবে। দলিল দাতার ডিজিটাল থাম ইম্প্রেশন/বায়োমেট্রিক দলিল রেজিস্ট্রেশনের সময় গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হবে।

(০৮) মূল দলিল স্ক্যান করে ডিজিটাল ছবি, ডিজিটাল থাম ইম্প্রেশন/বায়োমেট্রিক গ্রহণ করার পর দলিলের দাতা গ্রহীতার নাম, ঠিকানা এবং জমির তফসিল অর্থাৎ মৌজার নাম, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর সম্বলিত তথ্যাদি কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে সূচি বা ইনডেক্স প্রস্তুত করা হবে। পরবর্তীতে এই সকল তথ্য সহজেই অনলাইনে সার্চ করে দুদক বা অন্য কোনো প্রত্যাশী সংস্থা বা ব্যক্তি কোনো দলিলের মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবেন।

(০৯) পুরাতন বালামবইসমূহ রোবটিক স্ক্যানারের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে স্ক্যান করে সার্ভারে ডিজিটালি সংরক্ষণ করা হবে। পরবর্তীতে সার্টিফাইড কপির প্রয়োজন হলে স্ক্যান কপি থেকে প্রিন্ট আউটের মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুল সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। পুরাতন সূচিসমূহ পর্যায়ক্রমে ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে হালনাগাদ করা হবে। এতে খুব দ্রুত ও নির্ভুলভাবে দলিল তল্লাশির কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

(১০) মূল দলিলের স্ক্যান কপি ও সূচি বা ইনডেক্সের একাধিক কপি উন্নত মানের সিডিতে সংরক্ষণ করে রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তর, জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় ও সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের ডিজিটাল রেকর্ডরুমে সংরক্ষণ করা হবে। ফলে কোনো একটি রেকর্ড রুম থেকে কোনো তথ্য নষ্ট হলে বা চুরি হলে অন্য রেকর্ডরুম থেকে সংগ্রহ করে তা পুনর্গঠন করা সম্ভব হবে। এর ফলে পক্ষগণ ভবিষ্যতে তথ্য প্রাপ্তিতে কোনো প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হবে না।

৮.৮.৪ ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশনের সুবিধাদি

(০১) ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির প্রস্তাবিত ডিজিটালাইজেশন সম্পন্ন করা হলে একটি দলিল রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করে সর্বোচ্চ তিন (০৩) দিনের মধ্যে পক্ষগণকে মূল দলিল ফেরত প্রদান সম্ভব হবে।

(০২) জাল পর্চা বা ভূয়া ব্যক্তির মাধ্যমে জাল দলিল রেজিস্ট্রেশনের ঝুঁকি দূর হবে। ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করে দলিল রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ বন্ধ হবে।

(০৩) ওয়েব সাইট থেকে অটো-জেনারেটেড ওয়েব ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে দলিল রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দফা-ওয়ারি ফি ও করের এসেসমেন্ট স্লিপ সরবরাহ করায় আর্থিক দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ হবে।

(০৪) দলিলের ফরমেট অনুযায়ী দাতা বা গ্রহীতা নিজে দলিল প্রস্তুত করার সুযোগ পাবেন বিধায় মধ্যস্বত্বভোগীর উপদ্রব দূর হবে।

(০৫) জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদির ডাটা বেইজ সৃষ্টির ফলে মুহূর্তের মধ্যেই কোনো জমি ইতোপূর্বে হস্তান্তর হয়েছে কি না তা জানা সম্ভব হবে। দুদক, এনবিআর বা অন্য কোনো সংস্থা যে কোনো ব্যক্তির সম্পদ সম্পর্কে অন-লাইনে সার্চ দিয়ে খুব অল্প সময়ে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

(০৬) ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা সৃষ্টি হলে রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে জনগণকে উন্নত সেবা প্রদানে উৎসাহিত হবে। রেজিস্ট্রেশন বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। সরকারের প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে যা জনগণের কল্যাণে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করতে পারবে। সার্বিকভাবে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের জন্য হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত ভূমি রেজিস্ট্রেশন সেবা প্রদান নিশ্চিত হবে।

৮.৮.৫ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও গতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা

এ কথা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশ সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনেক ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করলেও দেশের সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা উত্তর সময়ে তেমন কোনো অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। দেশের সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ-(i) ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, (ii) ভূমি প্রশাসন ও (iii) ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগ এর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ভূমি জরিপ অধিদপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ভূমি প্রশাসন মূলত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এবং ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই এই তিন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে, যা দেশের সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় জটিলতা সৃষ্টি করছে।

দীর্ঘদিন যাবৎ ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করার জন্য আলোচনা হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে আগ্রহী হলেও আইন মন্ত্রণালয় প্রত্যাশিত সাড়া দিচ্ছে না মর্মে অনেকে মনে করেন। ফলে ভূমি সংক্রান্ত সেবা একই ছাতার নিচে পরিচালিত হওয়ার উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে না ।

প্রকৃতপক্ষে ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হলেই যে সকল সমস্যা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বিষয়টির এতটা সহজ প্রতীয়মান হয় না। কারণ বিদ্যমান কাঠামোতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কোনো প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা নাই। ভূমি প্রশাসন ও ভূমি জরিপের কার্যক্রম মূলত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে।

দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় সত্যিকার অর্থে গতিশীলতা ও গঠনমূলক পরিবর্তন আনতে হলে ভূমি জরিপ, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসা প্রয়োজন। ভূমি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই তিনটি বিভাগের সমন্বয় সাধন করতে হবে। এলক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ভূমি জরিপ, রাজস্ব কার্যক্রম একই ছাতার নিচে পরিচালনার জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগকৃত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ভূমি প্রশাসনে কর্মরত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যোগ্য কর্মকর্তাদের দ্বারা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

৮.৯ ইটভাটা স্থাপন সংক্রান্ত

৮.৯.১ সম্ভাব্য দুর্নীতি-অনিয়মের উৎস :

দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় অবৈধ ইটভাটা রয়েছে। ইটভাটা নির্মাণে লাইসেন্স প্রদানের প্রতিটি প্রক্রিয়ায় ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ এ এমন অভিযোগ আসার প্রেক্ষিতে একাধিক ইটভাটায় অভিযানও চালিয়েছে দুদক। এমনকি স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বেশ কিছু অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ইটভাটা ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতির ব্যাপকতা রয়েছে। এছাড়া অবৈধ ও পরিবেশবান্ধব নয় এমন ইটভাটাসমূহ স্থানীয় প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তার অনৈতিক যোগসাজশে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুসারে সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন বন, অভয়ারণ্য, বাগান বা জলা ভূমি বা কৃষি জমিতে ইটভাটা স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের স্থানে কীভাবে ইটভাটা চলছে তার সঠিক কারণও বোধগম্য নয়। এছাড়া ইটভাটায় কাঠ পোড়ানোর আইনি সুযোগ না থাকলেও অসংখ্য ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। আবার অনুমোদিত ইটভাটায় আধুনিক পরিবেশবান্ধব জিগজ্যাগ চিমনি ব্যবহার করার কথা থাকলেও ব্যবহার করা হচ্ছে সনাতন পদ্ধতির ড্রাম চিমনি। দুদকে বিভিন্ন উৎস হতে পাওয়া অভিযোগের বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায়, এর মূলে রয়েছে ইটভাটার মালিকদের সাথে স্থানীয় প্রশাসনের এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার অনৈতিক যোগসাজশ।

৮.৯.২ সুপারিশ

পরিবেশ অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথ এবং সমন্বিতভাবে অবৈধ এবং পরিবেশ বান্ধব নয় এমন ইটভাটাসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (Time Bound) চিহ্নিত করে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা যেতে পারে। অবৈধ ইটভাটাসমূহ উচ্ছেদের পর ঐ স্থানে কিংবা অন্য কোনো স্থানে কোনো অবস্থাতেই অবৈধ ইটভাটা নির্মাণ করতে দেওয়া যাবে না। এরপরও কোনো অবৈধ ইটভাটা স্থাপন করা হলে পরিবেশ অধিদপ্তরের যে কর্মকর্তার অধিক্ষেত্রাধীনে ইটভাটাটি স্থাপন করা হয়েছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় আনা যাতে পারে।

৮.১০ দীর্ঘমেয়াদি নৈতিকতার বিকাশে বিএনসিসি, স্কাউটিং ও গার্লগাইড কার্যক্রম :

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) কর্মকাণ্ড দেশের সকল মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক করার সময় এসেছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে বিএনসিসির কর্মকৌশলে সম্পৃক্ত হতে হবে। এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক, সচেতন, সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া অস্ত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসব তরুণরা স্বেচ্ছাসেবী সংরক্ষিত প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রয়োজনে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন স্বেচ্ছায় রক্তদান, পরিষ্কার পরিচ্ছনতা, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ইস্যুতেও এসব স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যবহার করা যেতে পারে। বিএনসিসি কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য বিএনসিসি কর্তৃপক্ষ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে বাজেট ব্যবস্থাপনাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে শতভাগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিএনসিসির প্রশিক্ষণের ফলাফল শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সংযোগের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া স্কাউটিং ও গার্ল গাইড কার্যক্রমে সকল শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহণের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তাদের সার্টিফিকেটে এ খাতে নম্বরের বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কাউটিং বা গার্ল গাইডের সার্টিফিকেট ছাড়া কেউ সরকারী চাকরির যোগ্য হবেন না মর্মে আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তবে কোন্ সময় থেকে এ প্রথা চালু হবে তা আইনেই নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৮. ১১ সরকারি পরিষেবায় মধ্যস্বত্বভোগী

সরকারি অধিকাংশ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে দালালদের দৌরাত্ম দেখা যায়। কমিশনের অভিযোগকেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ এ এমন অভিযোগের সত্যতাও পাওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের কারণে সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে সেবা প্রত্যাশী নাগরিকের দেখা করার সুযোগই হয় না। অভিযোগ রয়েছে এসব দালালদের সাথে কোনো কোনো অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশ রয়েছে।

৮.১১.১ সুপারিশ

(১) প্রশাসনিক নজরদারি বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(২) সেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ অফিসের নাম ও পদবি সংবলিত ছবিসহ পরিচয়পত্র অফিস চলাকালে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদেয় সেবাসমূহের তালিকা, সেবা প্রদানকারী দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি, মোবইল নম্বর, সেবা প্রদানের নির্ধারিত সময়, প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রের চেকলিস্ট ও নির্ধারিত ফি উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা। সাধারণ মানুষের জন্য হেল্পডেস্কের মাধ্যমে ফরম পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৩) প্রতিটি সেবা প্রদানের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলে- কী কারণে সেবা প্রদান করা হয়নি তা নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.১২ ওয়াসা

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনে ওয়াসার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠানটির কাজের সাথে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি সরাসরি সম্পৃক্ত। সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিনই ওয়াসার বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, অবহেলা এবং কর্মসম্পাদনে শৈথিল্যের সংবাদ পাওয়া যায়। দুর্নীতি দমন কমিশন এ সংস্থাটির এ জাতীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে পদ্ধতিগত সংস্কারে কতিপয় সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। এসব সুপারিশ প্রণয়নে কমিশন বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যসহ ভুক্তভোগী সেবা গ্রহীতাদের বক্তব্য, প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক বিবৃতি, নিরীক্ষা ও অডিট প্রতিবেদনও পর্যালোচনা করে। সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে কমিশন ওয়াসার কতিপয় দুর্নীতির সম্ভাব্য উৎস ও ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ করেছে। কমিশন এটাও বিশ্বাস করে এই সুপারিশ স্বতঃসিদ্ধ কোনো বিষয় নয়, তবে এগুলো বাস্তবায়ন করা হলে ওয়াসার কর্মপ্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হতে পারে।

৮.১২.১ দুর্নীতির সম্ভাব্য উৎস

(১) **প্রকল্প কাজে দুর্নীতি/অনিয়মসমূহ :** নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ না করে বিভিন্ন অজুহাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ও প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী এবং ওয়াসার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হয় না মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে। যেমন: ঢাকাসহ বৃহত্তর মিরপুর এলাকার পানির চাহিদা পূরণকল্পে মিরপুরের ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা হ্রাসকরণ প্রকল্পটি গত ২২.১১.২০১২ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী জিওবি ১৪২ কোটি, ওয়াসার ১০ কোটি, প্রকল্প সাহায্য (Export Import Bank of Korea, the Government Agency for the EDCF.) ৩৬৯ কোটি টাকাসহ মোট ৫২১ কোটি টাকার প্রকল্প জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ সময়ের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। পরবর্তী সময়ে ২৯.০৩.২০১৬ খ্রি. তারিখে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় ৫৭৩ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়, যার মধ্যে জিওবি ২০০.০৫ কোটি, ওয়াসার ১০ কোটি, প্রকল্প সাহায্য (Export Import Bank of Korea, the Government Agency for the EDCF.) ৩৬২.৯৫ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬ এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন, ২০১৭ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ না করে অযৌক্তিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় ৫২ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্পের কাজের অঙ্গসমূহের মধ্যে ৪৬টি উৎপাদনযোগ্য কূপ (Production wells), ২টি আয়রন অপসারণ প্লান্ট (Iron Removal Plants), ১টি ভূ-উপরিস্থ জলাধার (Over Ground Reservoir), ৭.৮১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ, ৪৮.৭৮ কি.মি. পানি সরবরাহ লাইন (২০০-১২০০ মি.মি. ব্যাস) নির্মাণকাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গত ২৭.১২.২০১২ তারিখে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হলেও ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তব কাজের অগ্রগতি মাত্র ৪৬.৭২%। এ কাজে ঠিকাদারকে ৩১৩.৭১ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা সংশোধিত ডিপিপি মূল্যের ৫৪.৭৫%। এক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতির সাথে ঠিকাদারের পরিশোধিত বিলের অনেক পার্থক্য রয়েছে।

(২) **'অন্তর্বর্তীকালীন পানি সরবরাহ প্রকল্পে' দুর্নীতি/অনিয়মসমূহ :** ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অটুট রাখার স্বার্থে প্রতিদিন ৪০ কোটি লিটার অতিরিক্ত পানি সরবরাহ করার জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন/রিজেনারেশন ও পানির লাইন নির্মাণ/পুনর্বাসনের জন্য মার্চ, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী জিওবি ২৪২.০০ কোটি ও ওয়াসার ১০.০০ কোটি টাকাসহ মোট ২৫২.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গৃহীত হয়। আলোচ্য প্রকল্পে মোট ১৬২টি গভীর নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন, ৩০টি গভীর নলকূপ রিজেনারেশন/রিহেবিলিটেশন ও ৭০ কিলোমিটার পানির লাইন নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮০.০০ কোটি ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫০.০০ কোটিসহ মোট ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ ও ব্যয় হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১৬২ টি গভীর নলকূপের কাজ শেষ হয়েছে মর্মে খাতাপত্রে দেখানো হয়েছে। রিভাইজড ডিপিপিতে ৩৭৫ টি গভীর নলকূপ স্থাপন/প্রতিস্থাপন, ১২০ টি গভীর নলকূপ রিজেনারেশন/ রিহেবিলিটেশন ও ১০০ কিলোমিটার পানির লাইন নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ আনুষঙ্গিক কাজ অন্তর্ভুক্ত করে ৬১২.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির রিভাইজড ডিপিপি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসর পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় প্রথম অনুমোদিত ডিপিপির মাত্র ৫১% হলেও পুনরায় (৬১২-২৫২)= ৩৬০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পটি মার্চ, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার কথা থাকলেও প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কয়েকটি গভীর নলকূপ স্থাপন ও কিছু পানির লাইন স্থাপন করা হলেও অধিকাংশ কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। যে কাজ হয়েছে সেই কাজের অগ্রগতির সাথে ঠিকাদারের পরিশোধিত বিলের অনেক পার্থক্য রয়েছে। দেখা যায়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ না করে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ও প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও ওয়াসার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকে মর্মে জানা যায়। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হয়নি মর্মে অভিযোগ রয়েছে।

(৩) **'সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেইজ-৩) প্রকল্পে' দুর্নীতি/অনিয়মসমূহ :** ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ৪৫৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ মধ্যে প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা। প্রকল্পের কাজের তেমন কোন অগ্রগতি নেই।

(৪) **'পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্পে' দুর্নীতি/অনিয়মসমূহ:** মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার পদ্মা নদীর তীরে যশলদিয়া নামক স্থানে পানি শোধনাগার নির্মাণের মাধ্যমে পুরাতন ঢাকা শহরের মিটফোর্ড, নবাবপুর, লালবাগ, হাজারীবাগ ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর এবং তৎসংলগ্ন এলাকাতে পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৪৫০ এমএলডি সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য ৩৫০৮.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৩ হতে ২০১৮ সালের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার কথা থাকলেও তা সমাপ্ত হয়নি।

(৫) **'ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পে' দুর্নীতি/অনিয়মসমূহ:** ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ৫২৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কথা। এ প্রকল্পে ২৩৮ কোটি টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হলেও কাজের অগ্রগতি মাত্র ৮% ।

(৬) **'দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্পে' দুর্নীতি/অনিয়মসমূহ :** ঢাকা শহরের গুলশান, বনানীসহ অন্যান্য এলাকায় পয়ঃবর্জ পরিশোধ প্রকল্পের জন্য ৩৩১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ মধ্যে সমাপ্ত করার কথা। এ যাবত প্রায় ১০১ কোটি টাকা জিওবি হতে পরিশোধ করা হয়েছে। কাজের অগ্রগতি একেবারেই নগণ্য।

(৭) **'ঢাকা মহানগরীর আগারগাঁও এলাকায় বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পে' দুর্নীতি/অনিয়মসমূহ :** জিওবি হতে প্রায় ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭ এর মধ্যে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা। প্রকল্পের তেমন কোনো অগ্রগতি নেই।

(৮) **'ঢাকা পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পে' দুর্নীতি/অনিয়মসমূহ :** প্রায় ৩১৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কথা। অদ্যাবধি প্রকল্পের কোন অগ্রগতি নেই। এ প্রকল্পের কাজের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না থাকলেও কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারগণকে বিল পরিশোধ করা হচ্ছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে।

(৯) **পরামর্শক ও ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি :** বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরামর্শক ও ঠিকাদার নির্বাচনের বিষয়ে দাতা সংস্থার গাইড লাইন ও ঋণ চুক্তির শর্তাবলি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে পরামর্শক ও ঠিকাদার নির্বাচনের বিষয়ে এমন কিছু শর্তারোপ করা হয়, যাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঠিকাদার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট পদ্ধতি ও রাজনৈতিক পরিচয় এবং কাজ পাওয়ার বিনিময়ে ঘুষ লেনদেন বর্তমানে একটি প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে স্পেশিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী প্রকল্পকাজ যথাসময়ে শেষ হয় না এবং প্রকল্পের ব্যয়ভার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।

(১০) **ব্যক্তি মালিকানাধীন গভীর নলকূপ স্থাপন, মিটার রিডিং ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি :** ব্যক্তি মালিকানাধীন গভীর নলকূপ স্থাপন, মিটার রিডিং ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ওয়াসা এখনও ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করায় প্রকৌশল ও রাজস্ব শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা মিলে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে, যার মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেয়া হচ্ছে।

(১১) **ওয়াসা কর্মচারীদের ওভারটাইম বিল সংক্রান্ত দুর্নীতি :** ঢাকা ওয়াসায় পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় ওয়াসার বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারীকে তাদের নির্ধারিত কার্য সময়ের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে ওভারটাইম বিল প্রদান করা হয় যা তাদের মূল বেতনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। অনেক ক্ষেত্রে কিছু প্রভাবশালী কর্মচারী ওভারটাইম না করেও ওয়াসার কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ওভারটাইম বিল উত্তোলন করে মর্মে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট ও জনশ্রুতিতে জানা যায়। এক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ঢাকা ওয়াসার কর্মচারীদের ওভারটাইম বিল অনেক বেশি মর্মে জানা যায়।

৮.১২.২ দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক টিমের সুপারিশমালা

(১) ঢাকা ওয়াসার চলমান প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন অনিয়ম/দুর্নীতি/অর্থ অপচয় রোধে বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থা কর্তৃক অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর সমন্বয়ে যৌথ পরিমাপ টিম ও মনিটরিং টিম গঠন করা যেতে পারে। এ সকল টিম গঠন করা হলে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারগণ প্রকল্পকাজ যথাসময়ে যথাযথভাবে সম্পাদনের বিষয়ে মনোযোগী হবেন এবং এতে সময়, অর্থ অপচয়/দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(২) প্রকল্পের প্রাক্কলন তৈরির সময় কাজের যথার্থতা ও উপযোগিতা আছে কি না তা ওয়াসা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত হতে হবে এবং বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় যাতে অহেতুক না বাড়ানো হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি আরোপ প্রয়োজন।

(৩) দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটিতে দাতা সংস্থার প্রতিনিধিসহ টেন্ডার ও ক্রয়কার্য যথাযথ হচ্ছে কি না তা মনিটরিং করার জন্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক শক্তিশালী টিম গঠন করা যেতে পারে।

(৪) প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের সময় ওয়াসার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার প্রকল্প পরিদর্শনসহ জনশ্রুত যেকোনো প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) ঠিকাদারকে বিল পরিশোধের পূর্বে এ মর্মে সুনিশ্চিত হতে হবে যে, দরপত্রের শর্তানুযায়ী ঠিকাদার প্রকল্পকাজ মানসম্মতভাবে সম্পন্ন করেছে। এছাড়া ঠিকাদার যতটুকু কাজ করছে তার গুণগত মান যাচাইয়ের উপরই তার বিল পরিশোধ করা যেতে পারে।

(৬) ব্যক্তি মালিকানাধীন গভীর নলকূপ স্থাপন, মিটার রিডিং ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ওয়াসা কর্তৃক ম্যানুয়াল পদ্ধতির ব্যবহার পরিহার করে সহজতর ডিজিটাল পদ্ধতিতে মিটার রিডিংয়ের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

(৭) অবৈধ ওভারটাইম বিল রোধকল্পে ঢাকা ওয়াসার কর্মচারীদের জনবল কাঠামো সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন এবং বেতনের সাথে ওভারটাইম বিলের সমন্বয়সাধনসহ সুর্নিদিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(৮) প্রকল্পকাজ বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা ওয়াসার কাজের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন : ঢাকা সিটি করপোরেশন, সওজ, বিদ্যুৎ বিভাগ ইত্যাদির সাথে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

(৯) ঢাকা ওয়াসার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে গণমাধ্যম, দুদক, অডিট ডিপার্টমেন্টসহ নজরদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

(১০) দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সেবা গ্রহীতাদের নিয়ে ঢাকা ওয়াসায় মাঝে মাঝে গণশুনানির আয়োজন করা যেতে পারে।

(১১) ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকৌশলী সংস্থার বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত সার্ভিলেন্স টিম কর্তৃক আকস্মিক পরিদর্শন করা যেতে পারে।

(১২) বিভিন্ন প্রকার ক্রয়ে প্রতিযোগিতামূলক উন্মুক্ত/ই-টেন্ডারিং, দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে কার্যাদেশ প্রদান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ সিনিয়র কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বুয়েটসহ অন্যান্য পেশাদার সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৮.১৩ আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট সংক্রান্ত

বাংলাদেশ অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক যেমন মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), মাথাপিছু আয়, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, প্রবাস আয়, বিনিয়োগ, ঋণ-জিডিপি'র অনুপাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। তারপরও দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বণ্টনসহ দেশের সার্বিক বিকাশে আরও টেকসই অগ্রগতির প্রয়োজন রয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, দেশের ট্যাক্স জিডিপি অনুপাত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এ কথাও সত্য বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বাজেটের অপ্রতুলতা লাঘবের জন্য ট্যাক্স জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বাস্তবতা হচ্ছে দেশের ট্যাক্স-জিডিপি'র অনুপাত এখনও ১০-এর নিচে রয়েছে। এথেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজার সময় এসেছে। ব্যক্তি পর্যায়ের আয়কর দাতার সংখ্যা (ট্যাক্স নেট) বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। কর না বাড়িয়ে বরং করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে ট্যাক্স-জিডিপি'র অনুপাত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া সার্বিকভাবে দেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি-অনিয়ম প্রশমন ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো:

৮.১৩.১ সুপারিশমালা

(১) দেশের উপার্জনক্ষম জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশকে এখনও আয়করের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় এনে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাগণ যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের আয়কর প্রদানে উৎসাহিত হন সে জন্য কিছু আইন ও বিধি সংশোধন করা সমীচীন। প্রথমত বর্তমানে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের জন্য যে সকল আয়কর বিবরণী আছে তা পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। আয়কর বিবরণী (Income Tax Return) সহজবোধ্য করলে করদাতাগণ আইনজীবী বা অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাদের রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন মর্মে প্রতীয়মান। বিশেষ করে দেশের এক বিরাট অংশ করদাতা যাদের প্রান্তিক করদাতাও বলা যায়। যারা মফঃস্বল অর্থাৎ উপজেলা পর্যায়ে থাকেন তাদের জন্য সহজ আয়কর বিবরণীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমান আয়কর বিবরণীতে অনাবশ্যক অতিরিক্ত তথ্য দাখিলের বিধান থাকায় এটি পূরণ করা সকলের জন্য সহজ নয়। উদাহারণস্বরূপ বলা যায় রিটার্নের সাথে সংযুক্ত ''সম্পদ ও দায়'' বিবরণীটি পূরণ করতে যথেষ্ট গাণিতিক পরিগণনার প্রয়োজন। এছাড়া ''পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের'' বিস্তারিত বিবরণী যা অনেকটা অসম্পূর্ণ ও অনাবশ্যক তা বাদ দেয়া উচিত। বর্তমানে ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদ থাকলে সম্পদ বিবরণী পূরণের দায় থেকে করদাতাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যাদের বার্ষিক করযোগ্য আয় ৭.৫০ লক্ষ/১০ লক্ষ টাকার অধিক নয় তাদের জন্যও সম্পদ বিবরণী ও পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যয়ের হিসাব দাখিল থেকে অব্যাহতি প্রদান করা যায়। উল্লেখ্য, কোনো করদাতা সম্পর্কে আয়কর ফাঁকির তথ্য পেলে সে ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিলের নোটিশ প্রদানের বিধান আয়কর আইনে আছে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মানুষকে কর প্রদানে উৎসাহিত করা এবং হয়রানির আতঙ্ক থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য আয়কর বিবরণী (Income Tax Return) সহজ ও বোধগম্য করা একান্ত জরুরি। এরূপ একটা সহজ আয়কর রিটার্নের নমুনা এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো (নমুনা সংযুক্ত)। উল্লেখ্য, একই সাথে ক্রমবর্ধমান করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে করদাতাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে ছোট পরিসরে আয়কর অফিস স্থাপন করা যেতে পারে।

(২) দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু খাতকে করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ মৎস্য চাষ, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি। বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রেও কর অবকাশ প্রথা চালু রয়েছে। তদুপরি বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের আয়ের ক্ষেত্রেও SRO জারির মাধ্যমে কর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং এখনও প্রদান করা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রকৃত করযোগ্য আয়ের উপর প্রদেয় আয়কর ফাঁকি দেয়ার লক্ষ্যে করমুক্ত/কর অবকাশপ্রাপ্ত খাত হতে অলীক ও অবিশ্বাস্য অংকের আয় প্রদর্শন করা হচ্ছে। এতে করে সরকার যেমন রাজস্ব হারাচ্ছে অন্য দিকে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়কেও করমুক্ত খাতের আয় হিসাবে দেখিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান করমুক্ত/কর অবকাশ বা হ্রাসকৃত কর হারকে বিলোপ করে যে সকল খাতের আয়কে করমুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন সে সকল খাতের একটি নির্দিষ্ট অংক পর্যন্ত আয়কে অর্থাৎ উক্ত খাতে নিয়োজিত ব্যক্তির পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য বাৎসরিক সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত রেখে অবশিষ্ট আয়কে স্বাভাবিক কর হারের আওতায় আনা প্রয়োজন। এরূপ কর ছাড়ের কারণে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং দুর্নীতি দমন করা কঠিন হচ্ছে। যদি কোনো খাতকে প্রণোদনা দেয়া একান্ত অপরিহার্য হয় তা হলে আয়কর/মূসক/শুল্ক ছাড়ের পরিবর্তে অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা যেতে পারে। অনেক জ্ঞাত-আয়বহির্ভূত সম্পদের মালিক আছেন, যারা তাদের পরিবারের সদস্যদের নামে যাদের কোনো নির্দিষ্ট আয়ের উৎস নাই ''ভূসিমাল'' বা বিবিধ মালামালের ব্যবসার নামে আয়কর নথি খুলে প্রারম্ভিক মূলধন সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন। এমন ব্যবস্থা বিলোপের লক্ষ্যে অবাস্তব এরূপ আয় প্রদর্শন করলে আয়কর আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সংযোজন করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়।

(৩) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক, মূসক ও উৎস আয়কর ছাড় প্রদান করা হয়। অনেক আমদানিকারক এ সুযোগে ব্যবসায়িক পণ্য আমদানি করে তা মূলধনী যন্ত্রপাতি হিসাবে ঘোষণা দিয়ে শুল্ক কর ফাঁকি দিচ্ছে। এরূপ কর ফাঁকি রোধে আমদানি পর্যায়ে ঘোষিত সকল মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে বাস্তব কায়িক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এছাড়াও ভূয়া মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির নামে বিদেশে অর্থ পাচারও হয়ে থাকে। সুতরাং মুদ্রা পাচার ও কর ফাঁকি রোধে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শতভাগ কায়িক পরীক্ষা (Physical examination) বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

(৪) আমাদের দেশে বর্তমানে ভূমি/ফ্ল্যাট ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত রেজিস্ট্রেশন মূল্য প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক কম দেখানো হয়। এ কারণে এক কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রয় করে একজন ১০ লক্ষ টাকা প্রদর্শন করে বাকি ৯০ লক্ষ টাকা লুকাতে সক্ষম হচ্ছেন। সুতরাং বাজার মূল্যের কাছাকাছি রেজিস্ট্রেশন মূল্যকে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৫) বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশের এক শ্রেণির মানুষের কাছে বিপুল পরিমাণ অপ্রদর্শিত অর্থ ও সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে বলে অনেকে মনে করেন। এরূপ অপ্রদর্শিত অর্থ সম্পদ অর্থনীতির মূলস্রোতে আনতে না পারলে তার গন্তব্য হতে পারে ভিন্ন দেশে। বিদেশে অর্থ পাচার রোধ করা বর্তমান বাস্তবতায় কঠিন। উন্নত দেশসমূহ অন্য দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের গচ্ছিত অর্থ বিনিয়োগের শর্তে নাগরিকত্ব পর্যন্ত প্রদান করছে। এক্ষেত্রে তারা এসব অর্থের উৎসের বিষয়ে বিন্দুমাত্র প্রশ্ন করে না। তাদের সমৃদ্ধির স্বার্থে তারা এরূপ কার্যক্রমকে ক্রমশ উৎসাহিত করে চলেছে। বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অর্থসম্পদ স্বাভাবিকভাবেই নিরাপদ স্থানে পুঞ্জিভূত হচ্ছে। সুতরাং আমাদের দেশের অর্থসম্পদ দেশে রাখতে হলে তার জন্য এর নিরাপত্তার আইনগত নিশ্চয়তা প্রদান করা এখন সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও মাদক পাচার থেকে উদ্ভূত আয় ব্যতীত অন্যান্য আয় ও সম্পদকে সুরক্ষা প্রদানের স্বার্থে নিম্নরূপ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৫-ক) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর, মূসক ও শুল্ক ফাঁকি রোধের জন্য সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (CIC) কাজ করছে। এ সেল মূলত গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা আনা প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট মাত্রার কর ফাঁকির ক্ষেত্রে এ সংস্থা উদ্যোগী হয়ে কাজ করবে তা নির্ধারণ করা জরুরি। অন্যথায় ছোট ছোট কর ফাঁকির বিষয় যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ফিল্ড অফিসসমূহ নিরোধ করতে সমর্থ সে সকল কর ফাঁকির বিষয়ে CIC র সম্পৃক্ত না হওয়াই শ্রেয়। এছাড়া কর ফাঁকির তথ্য পাওয়ার পর এ থেকে প্রাপ্য রাজস্ব আদায় ও মামলা নিষ্পন্নে অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ্য করা যায়। কর ফাঁকির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কোনো একটি কর ফাঁকির বিষয়ে অনুসন্ধান শুরুর পর এক বছরের (ছয় মাসও হতে পারে) মধ্যে রিপোর্ট প্রদান ও করদায় নির্ধারণের সময়সীমা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এর ফলে এ সংস্থার কাজে দায়বদ্ধতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং কর ফাঁকিবাজদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। সিআইসির কার্যক্রমের সাথে যুক্ত কর্মকর্তাদেরকে প্রণোদনা স্বরূপ বিপুল পরিমাণ আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এরূপ গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য প্রণোদনা প্রদান যুক্তিসংগত হলেও তা একটি আইনের আওতায় যুক্তিসংগত পরিমাণের হওয়া উচিত। বর্তমানে প্রণোদনা প্রদান ব্যবস্থাটি পরীক্ষাপূর্বক প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে নির্দিষ্ট যৌক্তিক হারে প্রণোদনা প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। একইভাবে আয়কর, শুল্ক ও মূসক আদায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদানের যে বিধানাবলি রয়েছে তা পুনঃনিরীক্ষা করা প্রয়োজন। সিআইসি, এলটিইউ, শুল্ক বা মূসক আদায়ে তথাকথিত অসাধারণ ভূমিকা রাখার ভিত্তিতে মাত্রাতিরিক্ত প্রণোদনা/পুরস্কার প্রদান করা হলে এসব সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের মাঝে একটি আত্মশ্লাঘা জন্ম নেয় যা অন্য কর্মকর্তাদের অস্বস্তির কারণ হতে পারে। প্রতিবছর এবং সমগ্র কর্মজীবনে একজন কর্মকর্তার জন্য এরূপ আর্থিক প্রণোদনার একটা সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

(৫-খ) পৃথিবীর খুব কম দেশ আছে যেখানে শুল্ক বিভাগ ভ্যাট আদায় করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে ভ্যাট ও আয়কর একে অপরের পরিপূরক। ভ্যাটের মাধ্যমে ব্যবসার পরিধি অর্থাৎ বিক্রয়/আয় জানা যায় যা প্রকৃত আয়কর নির্ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এ কারণে আয়কর ও ভ্যাটকে একই প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনা প্রয়োজন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রত্যক্ষ কর প্রশাসনই ভ্যাট ও আয়কর আদায় করে থাকে। শুল্ক বিভাগের কাজের প্রকৃতির সাথে ভ্যাটের আদৌ কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বে আমাদের দেশে শুল্ক বিভাগ ভ্যাট আদায়ে নিযুক্ত। এতে প্রকৃত আয়কর ও ভ্যাট আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না।

(৫-গ) কর ফাঁকি, বিদেশে অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন ও মাদক পাচার রোধে রাষ্ট্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে কর ফাঁকি, অর্থ পাচার, সন্ত্রাসী অর্থায়ন অথবা মাদক পাচার সম্পৃক্ত তথ্য পরস্পরের মাঝে আদান প্রদানের মাধ্যমে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। এজন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মপরিধির আওতায় আন্তঃসংস্থা কাঠামো (সমন্বয় কমিটি) গঠন করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময় পর পর বা প্রয়োজনে এসকল সংস্থার প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে উল্লিখিত অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

আয়কর রিটার্ন ফরমের একটি খসড়া সংযোজন করা হলো:

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ এর ৩৬ নং অধ্যাদেশ) এর
অধীন আয়কর রিটার্ন ফরম

আইটি-

ব্যক্তিশ্রেণী ও অন্যান্য করদাতার জন্য
(কোম্পানী ব্যতীত)

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ | সার্বজনীন স্বনির্ধারণী | সাধারণ |

১. করদাতার নাম ঃ ----------

২. টিআইএনঃ

৩. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (যদি থাকে):

৪. জন্ম তারিখ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)ঃ
দিন মাস বৎসর

৫. (ক) কর সার্কেল---------- (খ) কর অঞ্চল ----------

৬. কর বৎসরঃ ---------- ৭. আবাসিক মর্যাদা ঃ নিবাসী ☐ /অনিবাসী ☐

৮. করদাতার শ্রেণীঃ ব্যক্তি ☐ ফার্ম ☐ ব্যক্তি সংঘ ☐ হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ☐

৯. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকারীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ ----------

১০. পিতার নামঃ ---------- ১১. মাতার নামঃ ----------

১২. ঠিকানাঃ ----------

---

১৩. টেলিফোন/মোবাইল ঃ ----------

১৪. ই-মেইলঃ ----------

১৪. ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে) ঃ ----------

করদাতার আয় বিবরণী

---------- তারিখে সমাপ্ত আয় বৎসরের আয়ের বিবরণী

ক্রমিক নং	আয়ের বিবরণী	টাকার পরিমান
১	বেতনাদি ঃ ধারা ২১ অনুযায়ী (তফসিল ১ অনুসারে)	
২	নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ ঃ ধারা ২২ অনুযায়ী	
৩	গৃহ সম্পত্তির আয় ঃ ধারা ২৪ অনুযায়ী (তফসিল ২ অনুসারে)	
৪	কৃষি আয় ঃ ধারা ২৬ অনুযায়ী	
৫	ব্যবসা বা পেশার আয়ঃ ধারা ২৮ অনুযায়ী	
৬	ফার্মের আয়ের অংশ ঃ	
৭	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের আয় ঃ ধারা ৪৩(৪) অনুযায়ী	
৮	মূলধনী লাভ ঃ ধারা ৩১ অনুযায়ী	
৯	অন্যান্য উৎস হতে আয় ঃ ধারা ৩৩ অনুযায়ী	
১০	মোট (ক্রমিক নং ১ হতে ৯)	
১১	বিদেশ থেকে আয় ঃ	
১২	মোট আয় (ক্রমিক নং ১০ এবং ১১)	
১৩	মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর	
১৪	কর রেয়াত ঃ ধারা ৪৪(২)(বি) অনুযায়ী (তফসিল ৩ অনুসারে)	
১৫	প্রদেয় কর (ক্রমিক নং ১৩ ও ১৪ এর পার্থক্য)	
১৬	পরিশোধিত কর ঃ (ক) উৎস হতে কর্তিত/সংগৃহীত কর ঃ (প্রমাণ্য দলিলপত্র/বিবরণী সংযুক্ত করুন) টাকা---------- (খ) ধারা ৬৪/৬৮ অনুযায়ী প্রদত্ত অগ্রিম কর (চালান সংযুক্ত করুন) টাকা---------- (গ) এই রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ৭৪) অনুযায়ী (চালান/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/চেক সংযুক্ত করুন) টাকা---------- (ঘ) প্রত্যর্পনযোগ্য করের সমন্বয় (যদি থাকে) টাকা---------- **মোট (ক), (খ), (গ) ও (ঘ)।**	-
১৭	ক্রমিক নং ১৫ ও ১৬ নং এর পার্থক্য (যদি থাকে)	টাকা----------
১৮	কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত ও করমুক্ত আয়ের পরিমাণ	টাকা----------
১৯	পূর্ববর্তী কর বৎসরে প্রদত্ত আয়কর	টাকা----------

* বিস্তারিত বিবরণাদির জন্য বা প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন ।

প্রতিপাদন

আমি---------- পিতা/স্বামী ----------

টিআইএনঃ | | | | | | | | | | | | | সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, এ রিটার্ন এবং বিবরণী ও সংযুক্ত প্রমাণাদিতে প্রদত্ত তথ্য আমার বিশ্বাস ও জানামতে সঠিক ও সম্পূর্ণ ।

স্বাক্ষর

স্থানঃ ----------
তারিখঃ ----------

(স্পষ্টাক্ষরে নাম)
পদবী ও
সীল মোহর (ব্যক্তি না হলে)

আইটি-১০ বি

পরিসম্পদ ও দায় বিবরণী (----------)

করদাতার নাম

টিআইএনঃ | | | | | | | | | | | | |

১. **(ক) ব্যবসার পুঁজি (মূলধনের জের)** টাকা ----------

(খ) পরিচালক হিসাবে লিমিটেড কোম্পানীতে শেয়ার বিনিয়োগ (ক্রয় মূল্য) টাকা ----------

কোম্পানীর নাম **শেয়ারের সংখ্যা**

২. **অ-কৃষি সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ অর্জন/ক্রয় মূল্য) ঃ**

জমি/গৃহ সম্পত্তি (সম্পত্তির বিবরণ ও অবস্থান) টাকা ----------

৩. **কৃষি সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ অর্জন/ক্রয় মূল্য) ঃ**

জমি (মোট জমির পরিমান ও জমির অবস্থান) টাকা ----------

৪. **বিনিয়োগঃ**

(ক) শেয়ার/ডিবেঞ্চার/সঞ্চয়পত্র/সঞ্চয় স্কীম **টাকা** ----------

(খ) ঋণ প্রদান **টাকা** ----------

(গ) অন্যান্য বিনিয়োগ **টাকা** ----------

মোট = টাকা ----------

৫. **মোটরযান (ক্রয়মূল্য)** টাকা ----------

মোটর যানের প্রকৃতি ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর

৬. **ব্যবসা বহির্ভূত অর্থ সম্পদ**

(নগদ, ব্যাংক ও অন্যান্য) টাকা ----------

মোট = টাকা ----------

মোট পরিসম্পদ টাকা ----------

৭. **বাদঃ ঋণ ও দায়** টাকা ----------

মোট দায় = টাকা ----------

৮. **এই আয় বৎসরের শেষ তারিখের নীট সম্পদ (মোট পরিসম্পদ হতে মোট দায়ের বিয়োগফল)** টাকা ----------

৯. **বিগত আয় বৎসরের শেষ তারিখের নীট সম্পদ** টাকা ----------

১০. **ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যয় ঃ**

পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা ঃ টাকা ----------

পূর্ণ বয়স্ক | শিশু

আমি বিশ্বস্ততার সাথে ঘোষণা করছি যে, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে আইটি-১০বি তে প্রদত্ত তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণ।

করদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ ----------

* বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সনদ/বিবরণী রিটার্ণের সাথে দাখিল করুন।

আয়কর রিটার্ন প্রাপ্তি স্বীকার পত্র

করদাতার নামঃ ---------- কর বৎসরঃ----------

টিআইএনঃ | | | | | | | | | | | | | সার্কেল---------- কর অঞ্চল----------

রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ঃ টাকা ---------- পরিশোধিত কর ঃ ----------

করদাতার নীট সম্পদ ঃ টাকা----------

আয়কর রিটার্ন গ্রহণের তারিখ ঃ ---------- রিটার্ন রেজিস্টারের ক্রমিক নং----------

আয় বিবরণীর প্রকৃতি ঃ [সার্বজনীত স্বনির্ধারণী] [সাধারণ]

গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

4

৮.১৪ বাংলাদেশ রেলওয়ে

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলের ভূমিকা ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য রেল বিভাগের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি অবৈধ দখল, রেলের নিয়োগ, কেনাকাটা, ইচ্ছাকৃতভাবে মূল্যবান সামগ্রী নষ্ট করাসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ কমিশনে প্রায়ই আসে। সংবাদপত্রেও এ জাতীয় সংবাদ দেখা যায়। সার্বিক বিবেচনায় রেল বিভাগের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে তাদের বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন রেলের দুর্নীতি-অনিয়মের কতিপয় সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিত করে তা নিরসণে কতিপয় সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। কমিশন মনে করে, এ জাতীয় সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হলে রেলের সুশাসনের সূচকের ইতিবাচক উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে।

৮.১৪.১ দুর্নীতির উৎস

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্বাঞ্চল) চট্টগ্রাম এবং (পশ্চিমাঞ্চল) রাজশাহীর অধীনে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি লিজ/ হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে–

(ক) রেলওয়ের অনেক জলাশয়/পুকুর নিয়ম বহির্ভূতভাবে লিজ প্রদান করা হয়। যার ফলে সরকারি রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় হয় না।

(খ) রেলওয়ের জায়গায় রেল-সংশ্লিষ্টদের যোগসাজশে স্থাপনা নির্মাণ করতে দেয়া হয় এবং এ থেকে রেলওয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়ে থাকেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে।

(গ) সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা, যথাযথ তদারকী ও মনিটরিং এর অভাবে রেল বিভাগের শত শত একর ভূমি বেদখল হয়ে আছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক অবৈধভাবে দখল করে বাসা বাড়িসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

(২) রেলওয়ের অধীনে ওয়াগন, কোচ, লোকোমোটিভ, ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিএমইউ) ক্রয়/সংগ্রহসহ অন্যান্য ক্রয়/ সংগ্রহ কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনের স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থা পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের ডাবল লাইন, সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়েতে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কাজে দুর্নীতি হয়ে থাকে।

(৬) বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিএস/কারখানা সৈয়দপুর, নীলফামারী; বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চল, পাকশী; বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা; বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট; পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিজি এবং এমজি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন নিলামে যন্ত্রাংশ বিক্রয় প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যথাযথ Balast লাইনে না দেয়া, যন্ত্রাংশ সংস্থাপন যথাযথভাবে না করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়ে থাকে।

(৭) রেলওয়ের অধীনে ওয়ার্কশপগুলো কার্যকরী না করে আমদানির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে স্লিপার ফ্যাক্টরি অকার্যকর রেখে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়ে থাকে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

(৮) রেলওয়ের টিকিট বিক্রির ক্ষেত্রে কালোবাজারি হয়ে থাকে এবং এ কালোবাজারিতে বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীগণ জড়িত থাকেন। কতিপয় দালাল বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের সহযোগিতায় আন্তঃনগর ট্রেনের অধিকসংখ্যক টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে, যার কারণে জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয় ।

(৯) যাত্রীবাহী ট্রেন ইজারা প্রদানে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যাত্রীবাহী ট্রেনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট হতে জনসাধারণ কাঙ্ক্ষিত সেবাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

(১০) আন্তঃনগর ট্রেনসহ অন্যান্য ট্রেনে সরবরাহকৃত ও বিক্রিকৃত খাবারের মান নিম্নমানের ও জনস্বাস্থ্যের জন্য সহায়ক নয় মর্মে জানা যায়। এছাড়া, ট্রেনে সরবরাহকৃত খাবারের দামও তুলনামূলকভাবে বেশি। এক্ষেত্রে যথাযথ তদারকি ও মনিটরিং এর অভাব রয়েছে।

৮.১৪.২ দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক টিমের সুপারিশমালা

(১) বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান (যেমন : আইবিএ, বুয়েট, বিএমসি) এর সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা গ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(২) বিভিন্ন প্রকার ক্রয়ে প্রতিযোগিতামূলক উন্মুক্ত/ই-টেন্ডারিং, দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে কার্যাদেশ প্রদান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ সিনিয়র কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় পিপিআর অনুযায়ী পরামর্শক নিয়োগে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান (বুয়েট/রুয়েট/ চুয়েট/কুয়েট/ডুয়েট ইত্যাদি) কে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

(৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কোয়ার্টার/বাসভবন/অফিস স্থাপনার সম্পত্তিসমূহ ডিজিটাল ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে তালিকা প্রস্তুত করাসহ অবৈধভাবে দখলকৃত সম্পত্তিসমূহ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে আনতে হবে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ও দক্ষ আইনজীবী প্যানেল গঠনপূর্বক বিজ্ঞ আদালতসমূহে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৪) এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা যেতে পারে। উক্ত ডাটাবেইজ–এ যে সকল সম্পত্তি অবৈধ দখলদারদের দখলে রয়েছে তার তালিকা তৈরি করে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট এর নেতৃত্বে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকৃত সম্পত্তি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এনে তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে একটি সেল গঠন করা যেতে পারে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়ার্কশপ ও স্লিপার ফ্যাক্টরিগুলো সচল এবং কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৬) কোচ আমদানি নিরুৎসাহিত করে রেলওয়ের নিজস্ব ফ্যাক্টরীতে কোচ নির্মাণ করার সক্ষমতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(৭) মনোপলি বা একচেটিয়া ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পিপিএ এবং পিপিআর অনুসরণ করা যেতে পারে।

(৮) বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের (যেমন : বুয়েট/চুয়েট/কুয়েট/রুয়েট/ডুয়েট) মাধ্যমে নতুন লাইন নির্মাণ/সংস্কার কাজ তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৯) অডিট কার্যক্রম জোরদার করা এবং অডিট আপত্তি জরুরিভাবে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(১০) পিপিআর অনুযায়ী স্বচ্ছতার সঙ্গে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির মাধ্যমে রেলওয়ের পুরাতন মালামাল (লৌহজাত) বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১১) টিকিট কালোবাজারি রোধে টিকিট বিক্রয়ে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার ও নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, যাতে কোন অবস্থাতেই টিকিট কালোবাজারি না হয়।

(১২) বাংলাদেশ রেলওয়ের পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রে সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠাকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(১৩) আধুনিকায়নের মাধ্যমে যাত্রী সেবা বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল নিশ্চিতকরণ; যাত্রী নিরাপত্তা ও মালামাল পরিবহনে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত বগি, লোকোমোটিভ ও ওয়াগন ক্রয়সহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

(১৪) আন্তঃনগর ট্রেনসহ অন্যান্য ট্রেনে সরবরাহকৃত/বিক্রিকৃত খাবার মানসম্মত বা স্বাস্থ্যসম্মত কি না সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রেনের পরিচালক (গার্ড) এর নেতৃত্বে একটি যথাযথ তদারকি ব্যবস্থা থাকা দরকার। এছাড়া, খাবারের দামও যৌক্তিক নির্ধারণের জন্য অর্থাৎ কোন্ খাবারের কত দাম তা কেবল মুনাফার কথা চিন্তা না করে যাত্রীরা যাতে যৌক্তিক দামে খাবার ক্রয় করতে পারে সে বিষয়েও যথাযথ তদারকি ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(১৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় (অটোমেশন) পদ্ধতির আওতায় আনয়ন করা যেতে পারে।

৮.১৫ স্থায়ী সিভিল সার্ভিস সংস্কার কমিশন গঠন (Civil Service Reform Commission)

৮.১৫.১ ভূমিকা

সিভিল সার্ভিস যে কোনো আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনপ্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। একটি দক্ষ, সুসংহত এবং গতিশীল সিভিল সার্ভিস সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মূল শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। আদর্শগতভাবে, প্রজাতন্ত্রের কর্তব্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো রাজনৈতিক অধিকর্তাদের সাথে নির্মোহভাবে দায়িত্ব পালনে সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণ যেমন সর্বদা প্রস্তুত থাকেন তেমনি সংস্কার এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সিভিল সার্ভিসকেও সদা জাগ্রত থাকা উচিত।

পুনর্গঠন, আধুনিকায়ন, রূপান্তর, উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রকারান্তরে বিভিন্ন মাত্রার 'সংস্কার' কার্যক্রমকেই বুঝিয়ে থাকে। সংস্কার কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা, কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়াকে সহজ এবং জটিলতামুক্ত করা, গুরুত্ব বিবেচনা করে কাজের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা, ব্যয় হ্রাস করা এবং সমন্বিত নীতি প্রণয়ন করা। সিভিল সার্ভিস সংস্কার বলতে আমরা মূলত সেবাধর্মী, কার্যকর এবং ব্যয় সাশ্রয়ী সিভিল সার্ভিস গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করাকে বুঝে থাকি।

৮.১৫.২ সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের রয়েছে প্রায় দেড়শত বছরের ইতিহাস। উপনিবেশ উত্তর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সিভিল সার্ভিস সংস্কার কার্যক্রম এদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রীতিনীতি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই নতুন সরকার পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সিভিল সার্ভিসকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পুনর্গঠন করে এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে তুলতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল। সিভিল সার্ভিস ও জনপ্রশাসন সংস্কার সাধনে যথোপযুক্ত উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৯৭১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ২১টি কমিশন/কমিটি/সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিগত সময়ে এসব আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কাঠামোগত, পদ্ধতিগত এবং ধারণাগত সংস্কার গ্রহণে অদৃশ্য ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃতপক্ষে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বিবর্তন, উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পট-পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত বিকাশ ইত্যাদি কারণে এ ধরনের দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সংস্কার কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়েছে।

৮.১৫.৩ সিভিল সার্ভিস সংস্কার কেন আবশ্যক? স্থায়ী কমিশনের যৌক্তিকতা

বহুবিধ কারণ ও ঘটনাক্রম একটি দেশের সিভিল সার্ভিস সংস্কারে ভূমিকা পালন করে। সিভিল সার্ভিস সংস্কারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:

- প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কাঠামোতে কঠিন নিয়ম-কানুন এবং অপ্রয়োজনীয় জটিলতার কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ সহজ-সরল পদ্ধতি প্রত্যাশা করে। তাঁরা চায় দীর্ঘসূত্রতা ও ফলাফলের চেয়ে নিয়ম-কানুন পালনে গুররুত্বারোপ করার প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণীত হোক।
- দুর্নীতি প্রতিরোধ করে দক্ষতা এবং শুদ্ধাচার ভিত্তিক জনপ্রশাসন গঠন করার লক্ষ্যে সময় সময় সিভিল সার্ভিসকে সংস্কার করার প্রয়োজন হয়।
- কাজের ফলাফলের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মসংস্কৃতি, গতিশীলতা এবং উদ্ভাবন সহায়ক নতুন বা আধুনিক জনব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য সিভিল সার্ভিসে সংস্কার সাধন করতে হয়।
- নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অযৌক্তিক পদ-সোপানের পরিবর্তে ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলি ক্রমাগতভাবে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা থেকেও সিভিল সার্ভিস সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়া হয়।
- জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণে আর্থসামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে উন্নয়ন প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়ম-কানুনের বেড়াজাল হতে মুক্ত করতে সিভিল সার্ভিস সংস্কার করা দরকার।
- মেধাভিত্তিক মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, দক্ষ কর্মী নিয়োগ এবং সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের মেধা বিকাশে প্রায়োগিক পদ্ধতি প্রবর্তন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার আবশ্যক।
- সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল চাহিদা পূরণ করে সিভিল সার্ভিসের মানোন্নয়ন এবং জপ্রশাসনে উৎকর্ষ অর্জন করতে কৌশলগত প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্যও সিভিল সার্ভিস সংস্কার করতে হয়।
- সংসদীয় তদারকি এবং প্রশাসনিক শুদ্ধাচারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য পরিবর্তনশীল ও যৌক্তিক রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দর্শনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়োজনে সিভিল সার্ভিসকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়।

বর্ণিত লক্ষ্য এবং প্রয়োজনীয়তার নিরীখে সদা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক বাস্তবতায় যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশে স্থায়ী সিভিল সার্ভিস সংস্কার কমিশন গঠনের জন্য রাষ্ট্রকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এ কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্যও প্রযোজ্য।

প্রস্তাবিত সিভিল সার্ভিস সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলিতে বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকতে পারে:

ক) বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং উন্নয়নে গতি বজায় রাখতে স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে দাপ্তরিক কর্মপদ্ধতি নতুন করে নির্ধারণ, জনসেবার মানোন্নয়ন, প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়ন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত উদারীকরণ;

খ) স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালীকরণ, দুর্নীতি রোধকরণ, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অসমতা এবং আন্তক্যাডার বৈষম্য দূরীকরণ;

গ) নির্বাহী বিভাগের উপর সংসদীয় তদারকি বৃদ্ধিকরণ এবং সংবিধানের মূলনীতি ও সংশ্লিষ্ট আইনের আলোকে নজরদারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ।

৮.১৫.৪ কমিশনের কার্যপরিধি

সিভিল সার্ভিসের মানোন্নয়ন এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সিভিল সার্ভিস সংস্কার কমিশনের নিম্নরূপ কার্যপরিধি হতে পারে:

- নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, পেশাগত পরিকল্পনা, বিশেষায়িত জ্ঞান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সমতা ও অন্তর্ভুক্তিসহ সিভিল সার্ভিসের মৌলিক বিষয়ে সরকারকে নীতিগত পরামর্শ প্রদান করা;
- প্রয়োজনবোধে নতুন আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনি কাঠামো সংশোধন করতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
- সিভিল সার্ভিসের সামগ্রিক গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং যেকোনো ধরনের অনৈতিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হলে বা বোধগম্য হলে তা রোধ করতে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা;

- নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করে তা প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ প্রদান করা;
- সময়ানুগ চাহিদা পর্যালোচনা করে সে অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত ও কার্যকরী সংস্কারের জন্য সুপারিশ করা;
- নাগরিক-কেন্দ্রীক জনপ্রশাসন বিনির্মাণে কীভাবে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে একই প্রবাহে পরিচালিত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া;
- জনস্বার্থে সংসদ বা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্য যেকোনো কার্যক্রম সম্পাদন করা।

৮.১৫.৫ কমিশনের ক্ষমতা

কমিশনকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রদানের জন্য সরকার 'স্থায়ী সিভিল সার্ভিস সংস্কার কমিশন আইন' প্রণয়ন করতে পারে:

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যাবলির সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা;
২. কেবল জাতীয় সংসদ এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়বদ্ধতা;
৩. চেয়ারম্যান এবং কমিশনারগণকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ (০৫) বছরের মেয়াদে নিয়োগ প্রদান;
৪. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধান সাপেক্ষে যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি অফিস/সংস্থা পরিদর্শন এবং যে কোনো ধরনের দলিলাদি, তথ্য বা রেকর্ড অবাধে পর্যালোচনা করার কর্তৃত্ব;
৫. কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রণীত সুপারিশমালার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের ক্ষমতা;
৬. কমিশনের কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা চাওয়ার ক্ষমতা;
৭. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপরিধির আলোকে প্রয়োজনবোধে কমিশন স্থায়ী বেতন কমিশন হিসাবেও দায়িত্ব পালন করতে পারে;

৮.১৫.৬ কমিশনের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারের (বর্তমানে ২৬টি) কর্মপরিধির আওতায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে কমিশন সংস্কারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে:

১. জনপ্রশাসন/ সুশাসন
২. অর্থনীতি ও উন্নয়ন
৩. শিক্ষা ও সমাজ সেবা
৪. স্বাস্থ্য ও পরিবেশ
৫. যোগাযোগ, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি
৬. অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা
৭. আইন, জাতীয় নীতি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
৮. রাষ্ট্রীয় ও জননিরাপত্তা
৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
১০. পরিকল্পনা ও উদ্ভাবন

৮.১৫.৭ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

ক) একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এবং পাঁচজন কমিশনারের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হতে পারে; মহামান্য রাষ্ট্রপতি একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবেন।

খ) কমিশনের পাঁচটি ইউনিটের আওতায় উল্লিখিত দশটি সেক্টর পরিচালনা করা যেতে পারে; একজন কমিশনার একটি ইউনিটের দায়িত্ব থাকতে পারেন।

গ) প্রস্তাবিত 'স্থায়ী সিভিল সার্ভিস কমিশন আইন' এর মাধ্যমে এই মর্মে আইনি সুরক্ষা প্রদান করা আবশ্যক যে কেবল কোনো কমিশনারের পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিশনের কোনো কার্যক্রম অবৈধ হবে না এবং এ বিষয়ে কোন আদালতে প্রশ্নও উত্থাপন করা যাবে না।

ঘ) প্রতিটি কার্যনির্বাহী সেক্টরের জন্য একজন করে মোট ১০ জন মহাপরিচালক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।

ঙ) কমিশনের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য সরাসরি চেয়ারম্যানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে একজন সচিব পদায়ন করা যেতে পারে।

৮.১৫.৮ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন

উপরে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রস্তাবসমূহ একটি সিভিল সার্ভিস সংস্কার কমিশন গঠনের জন্য কেবল প্রাথমিক রূপরেখা। তবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিদ্যমান প্রেক্ষাপট এবং সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনান্তে দীর্ঘমেয়াদি চাহিদার কথা বিবেচনা করে সরকার একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করতে পারে। এই কমিটি একটি পূর্ণাঙ্গ কমিশন গঠনের লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশাসনিক, আইনি ও কার্যকরী (functional) কাঠামো পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণ এবং গবেষণা পরিচালনা করে বিস্তারিত সুপারিশসহ গবেষণা প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপন করবে। একটি স্বতন্ত্র ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থায়ী সিভিল সার্ভিস সংস্কার কমিশন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার বিশেষজ্ঞ কমিটি'র প্রতিবেদন প্রয়োজনবোধে সংসদে উত্থাপন করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৮.১৬ বিবিধ সুপারিশমালা

৮.১৬.১ দেশের লিজিং কোম্পানি, নন-ব্যাংকিং ফিন্যানসিয়াল ইন্সটিটিউট, সমবায় সমিতি আইন অনুসারে পরিচালিত সমবায় ব্যাংক ও মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) কোম্পানিসমূহে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে প্রচুর পরিমাণে অর্থের লেন-দেন করে। দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রায়শই অভিযোগ আসে এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয়। দুদকের অনুসন্ধানেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। এসব সেক্টরেও বহুমাত্রিক দুর্নীতির সংক্রমণ ঘটেছে। তাই এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেন-দেনের স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতার জন্য-গ্রাহকদের নিকট থেকে নেওয়া অর্থের উৎস বাধ্যতামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সমীচীন বলে দুদকের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে যাতে জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত অর্থের লেন-দেন না হতে পারে- এ সংক্রান্ত একটি নীতমালা বা পরিপত্র জারি করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

৮.১৬.২ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে মানসম্মত শিক্ষার বিকল্প নেই। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের বৈশ্বিক দায়িত্ব। এছাড়া মানসম্মত শিক্ষা ব্যতীত সমাজ থেকে দুর্নীতিসহ সকল প্রকার অনৈতিকতা নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন। এ প্রেক্ষাপটে দেশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যমান পাস মার্ক ৩৩ শতাংশের পরিবর্তে ৫০ শতাংশে উন্নীত করা যেতে পারে। এছাড়া মানসম্মত শিক্ষার জন্য মানসম্মত শিক্ষকেরও কোনো বিকল্প নেই। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে নিয়মিত ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অঞ্চল ভিত্তিক দক্ষ প্রশিক্ষক প্যানেল সৃষ্টি করতে হবে। প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন তাদের পরবর্তী পদোন্নতি এবং পদায়নের ক্ষেত্রে যাতে ভূমিকা রাখে সেব্যবস্থা নীতিমালায় সংযুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বাস্তবসম্মত ক্যারিয়ার প্লানিং প্রণয়ন করতে হবে- যাতে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আসতে উৎসাহিত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা হবে কারিগরি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং উচ্চ শিক্ষা হবে গবেষণা ভিত্তিক।

৮.১৬.৩ দুদক ২০১৬ সাল থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দুদক আইনের বিধি-বিধান অনুসরণ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অথবা এদের অধীন দপ্তর বা সংস্থাসমূহের কার্যপ্রক্রিয়া পদ্ধতিগত সংস্কারের নিমিত্ত বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করছে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে কার্যত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগগুলো তেমন কার্যক্রম পরিচালনা করেনি। কমিশন এটাও মনে করে সরকারি পরিষেবা প্রদানে বিদ্যমান দুর্নীতি, হয়রানি নিরসনে পদ্ধতিগত সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। দুদক বিশ্বাস করে, এসব সুপারিশ বিচার-বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়ন করা হলে এসব প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতিগত অনিয়ম-দুর্নীতি-দীর্ঘসূত্রতাসহ জনহয়রানি কিছুটা হলেও লাঘব হতে পারে। যেহেতু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দুদক সংক্রান্ত বিষয়াবলি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাই দুদকের এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে দেওয়া যেতে পারে।

৮.১৬.৪ দেশের পুলিশি সেবার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে থানাসমূহ। এসব থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন পুলিশের পরিদর্শক পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ। থানা থেকে সাধারণ জনগণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সেবা পাচ্ছেন না-এমন অভিযোগ প্রায়শই পাওয়া যায়। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ দপ্তরেই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস-এর বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করছেন।

এ প্রেক্ষাপটে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ) ক্যাডারের সহকারী পুলিশ সুপার অথবা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের পদায়নের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তবে বর্তমানের কোটা সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে কমিশন থেকে অতীতেও সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

৮.১৬.৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭(১) অনুচ্ছেদে ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৭৭(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে ন্যায়পালকে মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যে কোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ দায়িত্ব প্রদানের সাংবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে। স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর অতিবাহিত হলেও সাংবিধানিক এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা হয়নি। দেশের সুশাসন তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ন্যায়পাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এ প্রেক্ষাপটে দেশে ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছে ।

৮.১৬.৬ সরকারি কর্মচারীদের নবম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল পদে পদোন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট সিলেবাসের আওতায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাস্তবসম্মত বলে প্রতীয়মান হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন ইতোমধ্যে পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতির ব্যবস্থা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে।

৮.১৬.৭ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে বদলি ও পদায়নের ব্যবস্থা করার মাধ্যমেই বহুল আলোচিত বদলি-পদায়নসম্পৃক্ত দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরা যেতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ন্যূনতম দুই বছর উপজেলা পর্যায়ে পদায়ন বাধ্যতামূলক করা সমীচীন। এই পদায়নের মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তারা তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের সরকারি পরিষেবা পেতে- দুর্নীতির কারণে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা অনুধাবন করতে পারবে এবং তা প্রতিরোধ করতে পারবে। এর মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাদের মননে দেশের সাধারণ নাগরিকের প্রতি সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ বিকশিত হবে। জনবান্ধব জনপ্রশাসনের ভিত্তি দৃঢ় হবে মর্মে আশা করা যায় ।

৮.১৬.৮ দেশে বিদ্যমান পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ যুগোপযোগী করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কারণ বিদ্যমান আইনের অধীনেই বেশকিছু ক্রয় দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন মামলাও দায়ের করেছে। এ প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে দক্ষ বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করে, দ্রুত সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার ফাঁকফোকড় চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই প্যানেলটি হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। দেশের ক্রয় কাজে সর্বাধিক সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রতিনিধিদেরও এই প্যানেলে যুক্ত করতে হবে। ক্রয় প্রক্রিয়ায়র শুরু থেকে বিজ্ঞাপন বা প্রচারসহ ক্রয় প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিদ্যমান পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, বিধি ও ইজিপি সিস্টেম কার্যকর,স্বয়ংক্রিয় জবাবদিহিমূলক হিসেবে প্রণয়ন করা সমীচীন বলে প্রতীয়মান হয়।

৮.১৬.৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করা মহাহিসাব নিরীক্ষকের সাংবিধানিক দায়িত্ব। নিরীক্ষা যে কোনো দেশের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে সাধারণত কমপ্লায়েন্স অডিটের মাধ্যমে অডিট সম্পন্ন করা হয়, তবে সীমিত পরিসরে আর্থিক এবং পারফর্মেন্স অডিট করা হয়। অডিটের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পূর্ববর্তী অনেক পুরাতন অর্থ বছরের অডিট সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদানে দীর্ঘ বিলম্ব। এতে একদিকে যেমন বাস্তব কারণেই অসংখ্য অডিট আপত্তি আসছে, আবার বিলম্বের কারণে তা নিষ্পত্তিও করা যাচ্ছে না। ফলে অডিটের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। তাই যে কোনো মূল্যে আর্থিক বছরের অডিট রিপোর্ট পরবর্তী আর্থিক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেওয়া সমীচীন। যৌথ যাচাইকরণ (Verification) ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সরকারি কোনো বিল পরিশোধ করতে পারবেন না, এমন একটি বিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে ।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

৯ম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর প্রতিটি বিধান পরিপালন করতে হয়। এ আইন অনুসরণ করেই প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও (২০১৯) কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিভাষিক এই প্রতিবেদনে বিগত বছরে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য তথ্য, পরিসংখ্যান, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, কর্মপরিকল্পনা, সুপারিশমালা, আলোকচিত্র ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে কমিশনের বিশাল এই কর্মযজ্ঞের বাস্তবচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিশনের প্রতিটি অনুবিভাগের কার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু অর্থনীতি নয়, বিভিন্ন সামাজিক সূচক যেমন শিশু মৃত্যু, মাতৃ মৃত্যু, গড় আয়ু ইত্যাদি কর্মযজ্ঞে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত রাখতে দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধ করে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দুর্নীতিকেই বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তবতা হচ্ছে দুর্নীতি এমন অপরাধ যা সকল উন্নয়নকে ভঙ্গুর করে দেয়। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৬ নম্বর লক্ষ্যমাত্রাটির মূল বক্তব্য এমন, 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।' এ থেকে অনুধাবন করা যায়, দুর্নীতি নির্মূল না করে কার্যকর জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

দুর্নীতিকে বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ উন্নত, উন্নয়নশীল, অনুন্নত সকল দেশেই দুর্নীতির প্রকোপ রয়েছে। তবে এর মাত্রাগত তারতম্য রয়েছে। দুর্নীতি গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের সুফল থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। এর মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, বাজার ব্যবস্থাপনার বিকৃতি ঘটে, সংগঠিত অপরাধ বৃদ্ধি পায়। উন্নয়নশীল দেশে দুর্নীতির প্রভাব আরো প্রকট হয়। দুর্নীতি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দেয়। সর্বগ্রাসী এই অপরাধ দমনে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন বিরামহীনভাবে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশন বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশে সমন্বিতভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করছে।

কমিশন দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত অসংখ্য প্রতিরোধমূলক অভিযান পরিচালনা করছে। এসব অভিযানের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। সরকারি সম্পদ উদ্ধার হয়েছে, হয়রানিমুক্তভাবে অসংখ্য নাগরিক তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পেয়েছেন, সেবা প্রদানকারী দপ্তরগুলো সচেতন হয়েছে। আবার দুর্নীতির ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই অভিযোগের অনুসন্ধানে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে। তদন্ত করে তাদেরকে আইন-আমলে সোপর্দ করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিরোধ, অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশন সমগুরুত্বে নির্মোহভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। আবার গণশুনানির মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা ও সেবা প্রত্যাশী জনগণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ব্যবস্থা করছে কমিশন। এর মাধ্যমে একদিকে স্থানীয়ভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের যেমন জবাবদিহি করতে হচ্ছে, তেমনি নাগরিকগণ তাদের অধিকার নিয়ে সচেতন হচ্ছেন । সার্বিকভাবে তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা আরো বিকশিত হচ্ছে।

কমিশনের নিজস্ব আউটরিচ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের নগর, মহানগর, জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নাগরিকদের নিয়ে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শুধু পরিণত নাগরিকদের নিয়ে নয়, কমিশন তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়েও সাংবৎসরিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের গ্রাম থেকে শুরু করে রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তরুণরাই জেগে উঠবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সন্তানই পিতাকে নিবৃত্ত করবে দুর্নীতির পঙ্কিলতা থেকে। এই প্রত্যাশায় তরুণদের নিয়ে কমিশন দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল নিয়ে কাজ করছে।

তারপরও দুর্নীতির মাত্রা জনআকাঙ্ক্ষা অনুসারে হ্রাস পেয়েছে বলার সময় এখনো আসেনি। তবে দুর্নীতি বিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এটা হয়তো সত্য। আইন আমাকে স্পর্শ করবে না এ ধারণাও হয়তো ভেঙেছে। অপরাধীর নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে ভাবার মানসিকতাও বদলেছে।

তারপরও বাস্তবতা হচ্ছে সীমিত সম্পদ নিয়ে দুর্নীতির মতো বহুমাত্রিক ফৌজদারি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদকের পক্ষে দুরূহ। কমিশন প্রত্যাশা করে, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আসবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, আমলাতন্ত্র, রাজনীতিবিদ, পেশাজীবীসহ সবাই সমন্বিতভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে এগিয়ে আসবেন। দুর্নীতির কুৎসিত সংস্কৃতির অবসান ঘটাবেন। শুদ্ধ মানুষের পরিশুদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ হবে। সাংবিধানিক অঙ্গীকারের বাস্তব রূপায়ণ ঘটবে-যেদিন রাষ্ট্র অনুপার্জিত আয় ভোগ করার সকল পথ রুদ্ধ করবে। অন্ধকারের অমানিশা কেটে আলোয় উদ্ভাসিত হবে বাংলাদেশ।

এই প্রতিবেদনে যে সকল বিভাগ বা সংস্থার দুর্নীতির উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে তা কোনোক্রমেই ঐ বিভাগ বা সংস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয়। বরং দুদকে প্রাপ্ত অভিযোগ, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন বা সংবাদ, বিভিন্ন গবেষণার ফল বিশ্লেষণ ও সর্বোপরি জনধারণা (Public Perception) বিবেচনায় রেখে স্বল্প পরিসরে দুর্নীতির খণ্ডিত চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জন-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে কিছু সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে যা যৌক্তিক বিবেচিত হলে বিদ্যমান আইন ও বিধির মধ্যে থেকে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক